প্রথম প্রকাশ — ১৩৫৭

প্রকাশক :
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীরণজিৎ সামুই
বাণী-শ্রী প্রিণ্টার্স
৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

নিবেদন

বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যের ঐতিহাসিক ড. সুকুমার সেনের 'গল্পের গাঁটছড়া' নামে প্রবন্ধপুস্তকটি বারো তেরো বছর আগে ছাপা হয়েছিল। এখন বইটির লেখাগুলি নতুন ভাবে সাজিয়ে এবং ছাপার ভুলত্রুটি সংশোধন করে এই আকাদেমি সংস্করণ প্রকাশ করা হল। লেখকপুত্র ড. সুভদ্রকুমার সেন এব্যাপারে প্রভূত সহায়তা করেছেন। তাছাড়া তাঁরই আনুকূল্যে বইখানি আকাদেমি থেকে প্রকাশ করার সুযোগ পাওয়া গেল। এজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

আচার্য সুকুমার সেনের এই মূল্যবান নিবন্ধগ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা কৃতার্থ বোধ করছি। পাঠক সমাজে বইটির যথাযোগ্য সমাদর হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সূচি

গল্পের গাঁটছড়া

মানুষের যেমন স্মৃতি আছে মানুষের গোষ্ঠীরও তেমনি স্মৃতি আছে, তবে তা আর এক ধরনের স্মৃতি। আপাতত মনে হতে পারে যে সে স্মৃতি তো ইতিহাস অথবা ইতিহাস-পুরাণ কাহিনী। কিন্তু তা নয়, ইতিহাসই বলি আর পুরাণ-কাহিনীই বলি তা তো ব্যক্তিবিশেষের বা ব্যক্তি-সমষ্টি-বিশেষের বুদ্ধি-প্রমার্জিত রচনা। তার মধ্যে যা আছে তা মানুষের স্মৃতির পর্যালোচনা অথবা সে পর্যালোচনার তলানি। তাতে মানবগোষ্ঠীর স্মৃতির যেটুকু রং বা রস আছে—যদি থাকে— তা ধরা যায় না। মানবগোষ্ঠীর স্মৃতি জমে আছে লোকসাহিত্যের মধ্যে, ছেলে-বুড়ো ভোলানো ছড়ার ও গল্পের মধ্যে। তবে তা এমনভাবে বিকীর্ণ হয়ে আছে যে টের পাওয়া খুবই দুর্ঘট।

মানুষের স্মৃতি মিশরের মমির মতো রক্ষিত হয়ে এসেছে তার লিখিত রচনায়— তার ধর্মকর্মের ব্যবস্থায়, তার পুরাণ-কাহিনীতে, তার জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থাবলিতে। আর মানবগোষ্ঠীর স্মৃতি রয়ে গেছে—যদি থাকে—তার, যেমন প্রাচীনকালের পরিধেয় বসনের আঁচলের গিঁটে, সে গিঁট হল লৌকিক ছড়া ও গল্প। সে গিঁট খুলতে পারলে তার মধ্যে থেকে সেকালের স্মৃতির ক্ষীণ সৌরভ নানা ফুলের, কর্পূরের, মৃগনাভির, চন্দনের— যেন টের পাওয়া যায়।

বিদেশী পন্ডিতেরা অনেক দিন থেকেই এইসব লৌকিক গল্প-ছড়ার গিঁট খুলে গাঁট ছাড়িয়ে ইতিহাসের নাগালের বাইরে যে প্রত্ন ও প্রাক-ইতিহাস আর তারও অগোচর যে কালস্রোতের প্রতিধ্বনি তা কিছু কিছু যেন শুনতে পেরেছেন। আমাদের দেশ— ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করে আমাদের প্রদেশ বঙ্গভূমি লোকসাহিত্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। সত্যকার বিদগ্ধ ও যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তির সামনে গবেষণার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে এই একটি।

আজ আমাদের এই আলোচনা তিনটি গল্প নিয়ে। একটি বাংলা ভাষার অপর দুটি জার্মান ভাষার। গল্পগুলির মধ্যে বাইরের মিল নজরে পড়বে না চট করে, তবে গিঁট গাঁট ছাড়িয়ে দেখলে তলায় সমভূমি পাওয়া যাবে। তখন বোঝা যাবে যে গল্প তিনটি হয়তো একদা কোন্ এক সুদূরকালের থেকে একই মানবগোষ্ঠীর স্মৃতির টুকরো বহন করে এনেছে।

বাংলা গল্পটি সংগ্রহ করেছিলেন বাংলা ব্যাকরণ রচয়িতা হ্যালেড (বা হ্যালডে) ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের আগে। তাঁর লেখা কাগজপত্র ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। সুতরাংঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে গল্পটি বাংলা লৌকিক গল্পের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রহণযোগ্য নিদর্শন। হ্যালেডের কাগজপত্র থেকে টুকে নিয়ে পুণ্যশ্লোক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

মহাশয় ছাপিয়ে দিয়েছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩২৮ সাল)। গল্পটি হয়তো অনেকেরই পড়া আছে। তবুও বলতে হচ্ছে আলোচনায় সুবিধার জন্যে। গল্পটি ভোজ-বিক্রমাদিত্য গল্পমালার (saga) মতো গড়া। তাল-বেতাল থাকলেও বেতাল পঞ্চবিংশতির মতো আগাগোড়া নয়। সংস্কৃত অথবা অন্য কোনো ভারতীয় আর্য-ভাষার গল্পটি মিলেছে বলে আমার জানা নেই। তবে কাহিনীর মধ্যে বিশিষ্ট বাঙালী অথবা বাংলা ঢং কিছু নেই।

ভোজপুরের রাজা ভোজের এক মেয়ে, অপূর্ব সুন্দরী, ষোলো বছর বয়স কিন্তু এখনও বিয়ে হয়নি। তার কারণ মেয়ে প্রতিজ্ঞা করে আছে, যে ব্যক্তি এক সারারাত্রি ধরে চেষ্টা করে তাকে কথা কওয়াতে পারবে তাকেই সে বিয়ে করবে। এই তার স্বয়ংবরে মৌনব্রত। দিগ্‌বিদিকে খবর দিয়ে রাজা ভোজ অনেক রাজা রাজপুত্রকে আমন্ত্রণ করে আনলেন, কিন্তু কেউই রাজকন্যার মুখ খোলাতে পারেনি, বিফল মনোরথ হয়ে চলে গেছে। বেশ কিছুকাল পরে অবন্তীর রাজা বিক্রমাদিত্যের কানে ভোজ রাজার অপূর্ব সুন্দরী মৌনব্রতধারিণী রাজকন্যার ব্যাপার পৌঁছল। তাঁর কৌতূহল এবং আগ্রহ জাগল। তিনি কাউকে কিছু না বলে সটান ভোজপুরে চলে গেলেন।

রাজবাড়িতে গিয়ে তিনি অতিথি হলেন, কিন্তু আত্মপরিচয় দিলেন না। খবর পেয়ে রাজা তাঁকে ডাকলেন। বিক্রমাদিত্য পরিচয় না দিয়ে বললেন যে তিনি কন্যার মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়ে তাকে বিবাহ করতে এসেছেন।

রাত্রিতে একঘরে দুটি খাটে বিছানা পাতা হল। সে ঘরে রাজকন্যা ও বিক্রমাদিত্য শয়ন করলেন, আর কেউ রইল না। একটু রাত হতে বিক্রমাদিত্য হেঁকে বললেন, 'ঘরে কেউ আছে নাকি?' বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে সর্বদা দুটো পোষা ভূত থাকত। কেউ তাদের দেখতে পেতো না। তাদের নাম তাল-বেতাল। ঘরে ঢুকেই রাজা তাদের বলে দিয়েছিলেন রাজকন্যার খাট ও পরিধান আশ্রয় করতে। রাজার হাঁক শুনে তাল-বেতাল সাড়া দিলে, 'কেন মহারাজ?' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'আর তো কেউ নেই। সাড়া দিলে কে তুমি?' তাল-বেতালের একজন বললে, 'মহারাজ আমি রাজকন্যার খাট।' রাজা বললেন, 'ভালো তোমার সঙ্গে গল্প করে রাত কাটাই। শোন তুমি।'

'এক দেশে এক সদাগর জাহাজ ভরতি জিনিসপত্র নিয়ে বাণিজ্যে গিয়েছিল। পথে তার জাহাজডুবি হয়। মরণাপন্ন হয়ে সে নদীর কিনারায় এসে পড়ে পাটা ধরে ভাসতে ভাসতে। এক মেয়ে জল আনতে এসে তাকে দেখে আর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে তাকে বাঁচায়। সদাগর সেইখানেই থেকে যায়। কিছুদিন পরে সে পড়ে এক ডাইনির নজরে। ডাইনি মন্ত্র পড়ে সদাগরকে ভেড়া বানিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে যায়। রাত্রিবেলায় তাকে মানুষ করে আবার দিনেরবেলায় ভেড়া করে দেয়। একদিন সে ভেড়া, দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গিয়ে রাজবাড়িতে ঢুকে পড়ে। রাজার লোকেরা তাকে কেটে মাংস খেয়ে ফেলে। এখন বল দেখি রাজকন্যার খাট, সদাগরের মৃত্যুর জন্যে দায়ী কে?'

খাট থেকে উত্তর এল, 'দায়ী সেই মেয়েলোক যে তাকে জল থেকে তুলে বাঁচিয়েছিল।'

রাজকন্যা ওই উত্তর শুনে বিরক্ত হয়ে খাট ছেড়ে মাটিতে শয়ন করলে।

আরও খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। তারপর আবার বিক্রমাদিত্য মুখ খুললেন। আর কে আছে হে ঘরে? রাজকন্যার কাছ থেকে কে যেন উত্তর দিলে, 'আজ্ঞে আমি মহারাজ!' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'তুমি কে বট?' উত্তর এল আজ্ঞে আমি রাজকন্যার পরিহিত বস্ত্র।' বিক্রমাদিত্য বললেন, 'বেশ বেশ। একটা গল্প শোন।'

'এক দেশে এক সদাগরের মেয়ের বিয়ের জন্য একই দিনে চার জন বর হয়ে এল। চার জনেই বিয়ে করতে চায়। বিষম ব্যাপার দেখে কনে ভয়ে মরে গেল রাত্রিবেলায়। সকালে চারজন বর তাকে বাইরে নিয়ে এল। সকলে কান্নাকাটি করতে লাগল। একজন শোকে আত্মহত্যা করলে, একজন নিজের ঘরে ফিরে গেল, একজন ওষুধ খুঁজতে বেরল, আর একজন দেহ আগলে রইল। যে ওষুধ আনতে গিয়েছিল সে ওষুধ এনে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে তুললে।

'এখন বল দেখি রাজকন্যার কাপড়, কার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হওয়া উচিত?'

রাজকন্যার কাপড়ের কাছ থেকে উত্তর এল, ' যে নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছিল, তার সঙ্গেই বিয়ে হওয়া উচিত।'

উত্তর শুনে রাজকন্যার খুব রাগ হল। কিন্তু গায়ের কাপড় তো খুলে ফেলা যায় না। তা ভাবতেই হাসি পেলে। রাজকন্যা খুব হেসে উঠল। আর অমনি বিক্রমাদিত্য তার হাত ধরে ফেললেন, 'এই তো মুখ খুলেছ।'

পরের দিন রাজকন্যাকে বিয়ে করে বিক্রমাদিত্য নিজের রাজ্যে ফিরে গেলেন।

এই গল্পটির সঙ্গে একটি জার্মান গল্পের গভীর ও অন্তরঙ্গ যোগ আছে। কিন্তু সে যোগ বাইরের থেকে সহজে ধরা পড়ে না। আগে গল্পটি শোনাই।

এক রাজদম্পত্তি অনেক সাধ্যসাধনা করে অবশেষে একটি কন্যা সন্তান লাভ করে। কিন্তু মেয়েটি প্রায় জন্মাবধিই ভূতগ্রস্ত ছিল। এই অবস্থায়ই যখন তার বয়স চোদ্দ তখন সে মারা যায়। তার দেহ কফিনে পুরে রাজবাড়ির সংলগ্ন গির্জা-ঘরে রাখা হয়। সেই ঘরে সৈনিক পাহারা থাকে। কিন্তু প্রতিদিনই রাত্রি বারোটা বাজলেই সেই ভূতগ্রস্ত মেয়েটি জেগে উঠে পাহারাদার সৈনিকের মুণ্ডপাত করে। পরের দিন নূতন পাহারাদার নিযুক্ত করতে হয়। এই ভাবে অনেকগুলি সৈনিক মারা গেল। রাজা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কী করবেন ভেবে পান না। এত সৈনিক মারা পড়ল।

একদিন পাহারা দেবার ভার পড়ল এক তরুণ অথচ দক্ষ সৈনিকের উপর। তার অত্যন্ত ভয় হল। সে ডিউটিতে যোগ দেবার আগে বিকালে রাজার কাছে তিন চার ঘণ্টা ছুটি চেয়ে নিয়ে কী করবে ভেবে না পেয়ে বনের দিকে গেল। সেখানে এক

বুড়োর দেখা পেলে। সে এক কাঠের গুঁড়ির উপর বসে আছে। তাকে দেখে বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমাকে অত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? কী হয়েছে?' সে বললে যে, তার উপর ভার পড়েছে রাত্রিতে রাজকন্যার মৃতদেহ পাহারা দেবার, কিন্তু যে পাহারা দেয় তারই মুণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়। শুনে বুড়ো তাকে সাহস দিয়ে বললে, 'ভাবনা নেই। তুমি এক কাজ কর। এই মন্ত্রপূত খড়ি নাও আর এই মন্ত্রপূত বস্ত্র নাও। গির্জাঘরে যেখানে বসে তুমি পাহারা দেবে তার চারদিকে এই খড়ি দিয়ে মণ্ডল এঁকে নিয়ো। আর তুমি রাত বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত মনকে কিছুতেই দমতে দিয়ো না। মৃতদেহ যখন কফিন থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসবে তখন সে চিৎকার করবে বলবে, "আমি জানি তুমি এখানে রয়েছ, তবে আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।" তার পর সে ঘরময় ঘুরে বেড়াবে কিন্তু তোমাকে দেখতে ও ছুঁতে পাবে না। এই ভাবে তোমার আজ রাত কাটবে।'

সকালে উঠে রাজা লোকজন নিয়ে গির্জাঘরে গেলেন। তিনি দেখে আশ্চর্য হলেন যে পাহারাদারের মাথা বিচ্ছিন্ন হয়নি, সে স্বচ্ছন্দে আছে। সে সৈনিককে রাজা আদেশ করলেন আরও দু-রাত পাহারা দেবার জন্যে। কী করে সে, অগত্যা রাজি হল।

সেদিনও সে বিকালে ছুটি নিয়ে বনে গেল। বুড়োর সঙ্গে তার দেখা হল। এবারে বুড়ো তাকে উপদেশ দিলে সে রাত্রিতে অর্গানের পিছনে লুকিয়ে থাকতে আগের দিনের মতো খড়ি দিয়ে মণ্ডল এঁকে। পাহারা দিতে এসে সৈনিক বুড়োর কথা মতো কাজ করল। মাঝ রাত্রি হতেই ভূতগ্রস্ত রাজকন্যা ঝাঁপ দিয়ে কফিন থেকে বেরিয়ে এল। আর ঘরময় দাপাদাপি করে ঘুরে বেড়াতে লাগল এই বলতে বলতে 'আমি জানি তুই আছিস্ কিন্তু তোকে আমি তো দেখতে পাচ্ছি না।' রাত একটা অবধি সে এই রকম করতে লাগল। তারপর কফিনে ঢুকে পড়ল।

সকাল বেলা দলবল নিয়ে রাজা এলেন সৈনিকের মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু এসে দেখলেন, সে আগেকার দিনের মতোই সুস্থ বহালতবিয়ত। তখন রাজা তাকে বললেন যদি সে আর এক রাত এই ভাবে কাটাতে পারে তাহলে রাজকন্যা মানুষ হয়ে বেঁচে উঠবে এবং সে যদি চায় তবে তার সঙ্গে রাজকন্যার বিয়ে দিতে পারেন।

তৃতীয় দিনে সৈনিক বিকালে ছুটি নিয়ে বনে গেল। বুড়োর সঙ্গে যথারীতি দেখা হল। বুড়োর উপদেশ সে চাইলে। বুড়ো বললে, তুমি এবারে বেদির পিছনে লুকিয়ে থেকো। ভূত কিন্তু আরও বেশি গোলমাল করবে, চারদিকে ছুটোছুটি করবে। তার মধ্যে ফাঁক পেয়ে সৈনিককে কফিনের মধ্যে ঢুকে পড়ে শুয়ে থাকতে হবে। তার পর ভূত যখন কফিনের কাছে এসে তাকে বেরিয়ে যেতে বলবে তখনও সে যেন সাড়া-সুড়ি না দেয়। তারপর যখন তার হাত ধরে টানবে তখন সে যেন ভূতের তর্জনী ধরে ফেলে তাতে খুব জোরে কামড় দেয়।

সৈনিক উপদেশ মতো কাজ করলে পর রাজকন্যার ভূত ছেড়ে গেল, সে সুস্থ মানুষের মেয়ে হল। তখন দুজন বেদির কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে প্রার্থনা করতে লাগল। লোকজনের সঙ্গে রাজা এসে তাদের দুজনকে এইভাবেই দেখতে পেলে। রাজা খুসি হয়ে সৈনিককে বললেন, 'তোমাকে জামাই করব।'

সকলে মহলে ফিরে এল। রাজকন্যার বিয়ে হল সৈনিকের সঙ্গে, প্রচুর খাওয়া-দাওয়া হল।

গল্পটি গ্রিম্‌দের সংগ্রহে নেই। এটি সংগৃহীত হয় ১৯৩৫ সালে সাইলেসিয়ার হেড্‌উইগ সুরমান কর্তৃক। কুট রামান সংকলিত ও লটি বাউঙ্কে অনূদিত 'ফোক-টেলস অফ জর্মনী' ২৩ সংখ্যক গল্প।

বিক্রমাদিত্যের গল্পের সঙ্গে সৈনিকের গল্পের গভীর মিল খুঁজে পাওয়া যাবে অমিলের মধ্যে দিয়ে। সে কেমন অমিলের মিল তা নীচে ছক্ বেঁধে দেখাতে চেষ্টা করছি। বাংলা ও জার্মান গল্পকে যথাক্রমে 'ক' ও 'খ' বলে চিহ্নিত করছি।

১। 'ক' রাজকন্যা মৌনী, অন্তত রাত্রিবেলায় শয়ন কক্ষে। 'খ' রাজকন্যা ভূতগ্রস্ত মৃত সুতরাং মৌনী। খাটে শুয়ে ক কন্যা মৃতবৎ থাকত। কেন না তা না হলে রাজা ডেকে বলতেন না, কে আছ এ-ঘরে। রাজকন্যা যখন খাটের উপর বিরক্ত হয়ে খাট ছেড়ে দিয়ে মাটিতে শুল তখন রাজা তা লক্ষ করেননি। তবে কি ক কন্যা অদৃশ্য ভূত হয়েছিল! সে প্রকট হয়েছিল হাসিতে। তখন রাজা তার হদিস পেয়ে তার হাত ধরেছিলেন।

'খ' রাজকন্যার কফিনের মতো কি ক রাজকন্যার খাটও দুষ্টশক্তিসম্পন্ন (enchanted) ছিল! দুজনেই তাদের শয্যাধারের বাইরে এসেই তবে কাবু হয়েছিল। এবং সৈনিক তাতে ঢুকেই তবে ভূত তাড়াতে পেরেছিল। 'খ' কাহিনীতে দুষ্টশক্তি রাজকন্যাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেছিল। 'ক' কাহিনীতে শক্তির উল্লেখ নেই বটে তবে ছিল বলে মনে হয়। বিক্রমাদিত্যের গল্প বলে সে শক্তি রাজার সহকারী হয়েছে।

২। 'ক' গল্পে কন্যা মৌনী, পাত্র (রাজা) মুখর। 'খ' গল্পে পাত্র সৈনিক মৌনী, কন্যা (বা ভূত) মুখর। এখানে দুটি গল্পে মৌলিক পার্থক্য আছে। ক গল্পে তুক ভেঙে গেল কন্যা মুখ খুলতেই। 'খ' গল্পে তুক ভেঙে গেল পাত্র (সৈনিক) মুখ খুলে কামড় দিতেই। এ দুটি মোটিফের মধ্যে যে মিল তা ভাসা ভাসা।

৩। 'ক' গল্পে নায়ক বিক্রমাদিত্য প্রবীণ অসমসাহসী মন্ত্রবিদ্ গুণী। 'খ' গল্পের নায়ক সৈনিক তরুণ সাহসী এবং বশংবদ। তাকে শক্তি দিয়েছে বনবাসী বুড়ো। বিক্রমাদিত্যকে শক্তি দিয়েছে তাঁর বুদ্ধি ও দুটি পোষা ভূত।

গল্প দুটি সুদুর কালের কোনো একটি গল্প থেকে শাখায়িত হয়েছিল। জর্মান গল্পটিতে খ্রীস্টান ধর্মের ছাপ পড়েছে। তবুও এটি মূল গল্পের বেশি কাছাকাছি। অনুমান করা যেতে পারে গল্পটি সেকেলে ভূতের গল্প ছিল। রাজকন্যা ভূতের কবলে পড়ে জড়বৎ

ছিল। সে ভূত প্রতি রাত্রিতে পাণিপ্রার্থী যুবককে গ্রাস করত। অথবা গল্পটিতে ভূত মোটেই ছিল না। রাজকন্যা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল। ব্যর্থ পাণিপ্রার্থীদের সে প্রাণদণ্ড দিত।

গ্রিমদের সংগৃহীত একটি গল্পে (এ গল্পটিতে 'গ' বলব)—নাম সোনার হাঁস— 'ক' গল্পের সঙ্গো মিল আছে শুধু হাসি-সমাধান মোটিফে। গল্পটি সংক্ষেপে বলি।

এক গৃহস্থের তিন ছেলে ছিল। বড় ছেলে দুটি বুদ্ধিমান ও সুরূপ। ছোট ছেলেটি হাবাগোবা ভালো মানুষ। বড় ছেলে এক দিন বনে যায় কাঠ কাটতে। মা তার সঙ্গো ভালো ভালো খাবার ও পানীয় দেয়। বনে ঢোকবার পর একটি লোকের সঙ্গো তার দেখা হয়। লোকটি তার খাবারের কিছু ভাগ চায়। সে দেয় না। তার ফলে গাছ কাটতে গিয়ে সে পা কেটে ফেলে এবং শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে আসে। তার পরে চাষির মেজো ছেলে বনে গেল কাঠ কাটতে। তার মনোভাব দাদার মতো ছিল সেও তাই আহত হয়ে ফিরে এল। তারপর যখন ছোট ছেলে বনে যেতে চাইলে তখন তার মা খুব অনিচ্ছা করে কিছু শুকনো রুটি আর বিস্বাদ পানীয় তার সঙ্গো দিলে। বনে গেলে পরে সেই লোকটি তার কাছে খাবার চাইলে ছেলেটি খুসি হয়ে তার সঙ্গো বাঁটোয়ারা করে খেলে। তখন লোকটি তাকে একটা গাছ দেখিয়ে তার গোড়া কাটতে বললে। সে গাছটার গোড়া কাটলে আর তার মধ্যে পেলে এক সোনার পালক হাঁস। হাঁসটি নিয়ে সে চলল শহর পানে। পথে রাত কাটালে সে এক গৃহস্থের বাড়ি অতিথি হয়ে। ভোরবেলা, তখনও ছেলেটি ঘুমোচ্ছে, গৃহস্থের বড় মেয়ে এসে হাঁস দেখে তার একটা পালক খুলে নিতে গেল অমনি সে হাঁসের সঙ্গো এঁটে গেল। তারপর তার মেজো ও ছোট বোন পর পর এসে বড় বোনের সঙ্গো আটকে গেল।

সকাল হতে কিছু না বলে ছেলেটি হাঁসকে বগলে ধরে শহর মুখে চলল। পথে পাদরি মশায় দেখলেন তিনটি মেয়ে এক হাঁসকে ছুঁয়ে এক ছোকরার পিছু পিছু চলেছে। তিনি দূর থেকে তাদের চলে আসতে বললেন। কেউ এল না দেখে তিনি মেয়েগুলিকে জোর করে আনতে গেলেন, কিন্তু ছোঁয়া মাত্রই তিনিও আটকে গেলেন। তারপরে পাদরি মশায়ের কেরানি তাঁকে এইরকমভাবে তিনটি মেয়ের পিছু পিছু যেতে দেখে তাঁর কাছে ছুটে গেল এবং তাঁকে টেনে আনতে গিয়ে নিজেও আটকে গেল। এইভাবে চাষি ছোকরার বগলে ধরা হাঁস ও সেই হাঁসের পিছনে সেঁটে থাকা পর পর পাঁচজনের বিচিত্র শোভাযাত্রা শহরের রাজপথ দিয়ে চলল।

এখন সে দেশের রাজার মেয়ে অত্যন্ত গম্ভীর-মেজাজ ও বিষণ্ণস্বভাব। সে হাসতে জানে না। রাজা প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তাকে হাসাতে পারবে তার সঙ্গোই মেয়ের বিয়ে দেবেন। রাজকন্যা জানালা থেকে রাজপথে এই বিচিত্র প্রোসেশন দেখে হেসে ফেললে। রাজা খুসি হয়ে ছেলেটার সঙ্গো মেয়ের বিয়ে দিলেন।

হাসির মোটিফটুকু ছাড়া এ গল্পের সঙ্গো ক গল্পের কোনো মিল নেই। 'গ' গল্পের সঙ্গো 'খ' গল্পেরও একটুখানি মিল আছে। দুটি গল্পেই পাত্রকে শক্তি দিয়েছে বনবাসী ব্যক্তি। অরণ্যচারী দেবতা অথবা তার অদৃষ্ট।

তিনটি গল্পের কিন্তু জাত আলাদা দাঁড়িয়েছে। 'ক' গল্প পড়েছে বুদ্ধিদীপ্ত হাসিখুসির শ্রেণীতে, 'খ' গল্প রয়ে গেছে ভয়ভক্তিদৈবশক্তির শ্রেণীতে আর 'গ' গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সরলচিত্তের দৈবপ্রসন্নতার শ্রেণীতে। এর মধ্যে যে হাসিখুসির মোটিফ আছে তা অলংকারের মতো, সমগ্র গল্পটিকে তা উদ্ভাসিত করেনি। 'ক' গল্পের যে হাসিখুশি মোটিফ তা গল্পটিকে উজ্জ্বল করেছে। এটা অবশ্য পরবর্তী কালে বুদ্ধি মার্জনার ফলেই হয়েছে।

'খ' গল্পের কফিন ও শবাচ্ছাদন বস্ত্র (shroud) 'ক' গল্পে হয়েছে যথাক্রমে রাজকন্যার খাট ও তার পরিহিত বস্ত্র। এই পরিবর্তন ভারতবর্ষের আচরণ ধারার অনুসরণেই সংঘটিত হয়েছে, আর এই শেষের পরিবর্তনটিকে ধরেই গল্পটিতে কৌতুকরসের ধারাটুকু উৎসারিত হয়েছে। গোড়াতে গল্পটি ভয় ভক্তি ভূত দৈবশক্তির শ্রেণীতেই ছিল। রাজকন্যাকে আশ্রয় করেছিল রক্তপায়ী ভূত (Vampire), সে পাহারাদারের মুণ্ড ছিঁড়ে রক্ত পান করত। কে জানে 'ক' গল্পে আসলে হয়তো অকৃতার্থ পাত্রকে রাত্রি অবসানে কোতল করা হত। গল্পে সে কথা উহ্য রয়ে গেছে। ভালোই হয়েছে।

পাওয়া ও হারিয়ে পাওয়া

ছেলেবেলায় হয়তো অনেকে গল্প শুনে থাকবেন যে কোনো এক অত্যন্ত দুর্গত দুঃস্থ মানুষ দেবতার (অথবা অপদেবতার) যাচিত কিংবা অযাচিত অনুগ্রহে তার দুর্গতি দুঃস্থতা মোচনের উপায় স্বরূপ কোনো বস্তু পেয়েছে, লোভীর কবলে পড়ে সে বস্তু হারিয়েছে আর আবার সেই দেবতার (অথবা অপদেবতার) করুণায় সে বস্তু পুনঃপ্রাপ্তি হয়েছে। যাঁরা ছেলেবেলায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গল্প সংকলন দুটি পড়েছেন অথবা দীনেন্দ্রকুমার রায়ের মজার গল্প সংকলনটি দেখেছেন—তাঁরা হয়তো মামদো ভূতের (ও বোম্বাই কিলের) কথা স্মরণ করতে পারেন।

এই গল্পের মতো আরও অন্তত দুটি গল্প আমাদের বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল। বাংলা দেশের বাইরেও হয়তো প্রচলিত ছিল। তার প্রমাণ, অযোধ্যা অঞ্চলে এমন গল্প মিলেছে। ভারতবর্ষের বাইরেও মিলেছে। একটি পাওয়া গেছে আর্মেনিয়া থেকে, তুর্কি ভাষায় আর একটি মিলেছে খাস ইংলন্ডে, ইংরেজি ভাষায়।

এই ছ'টি গল্পের মধ্যে মোটামুটি একটা বাইরের মিল আছে। গভীরতর মিল আছে গল্পগুলির কোনো কোনোটির সঙ্গো। এই সব পারস্পরিক মিল ও অমিল বিচার করে, গল্পগুলি কোনো একটি বীজ থেকে গজিয়েছিল কিনা, গজিয়ে থাকলে সে বীজ কোথাকার— আমাদের দেশের, না আর্মেনিয়া-তুর্কির, না বিলেতের? যদি মূল একটি না হয় তো কটি? এক গল্পের সঙ্গো অন্য গল্পের কলম বেঁধেছিল কিনা—এই সব সমস্যা মনে জাগে। সে সমস্যা সমাধানের কৌতূহল জাগাও অস্বাভাবিক নয়। আমার সেই কৌতূহল জেগেছে। জানি সে কৌতূহলকে প্রশ্রয় দিলে আমাদের উপস্থিত কালের কোনো দারুণ সমস্যার— না শিক্ষা ব্যবস্থার, না দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধের, না বিদ্যুৎ সংকটমোচনের, না ভোটাভুটির ধূলোট মিটোবার সুরাহার কোনোই ইঙ্গিত মিলবে না। একে বলতে পারেন লেখাপড়ার নিতান্ত ছেলেখেলা। তবে, এ খেলার মাঠে আমি অবাধ স্বাধীনতা অনুভব করছি। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীকে এ নিয়ে আসতে দেখছি না। পাঠকদের মধ্যে যাঁদের মনে ছেলেমানুষির রেশ একেবারে মিলিয়ে যায়নি তাঁদের ভালো লাগতে পারে। তাঁদের লক্ষ্য করেই আমার এই রকম তুচ্ছ রচনা নিক্ষেপ করছি।

প্রথম বাংলা গল্পটি আছে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'ভূতপেত্নী' বইটিতে (১৯০২)। বাংলা ছেলেভুলোনো গল্পকে বাংলা ভাষায় আর মুখের কথায়— সুতরাং টাটকাভাবে প্রথম সংগ্রহ করে ছাপিয়ে ছিলেন ইনিই (এ তথ্যটি অনেকেরই জানা নেই)। গল্পটির নাম

'মামদো ভূত'। লেখকের নিবাস ছিল হুগলি জেলায়, গরলগাছা গ্রামে। গল্পটি যথাসম্ভব তাঁরই ভাষায় উদ্ধৃত করছি। উপভাষার পদগুলি লক্ষ করবার মতো।

"একদিন একটা ভিখিরী সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে কোথাও ভিক্ষে পেলে না। পোড়া পেটের জ্বালায় অস্থির হয়ে বল্লে, 'আর এ প্রাণ রাখবো না। এই দেশে যে একটা ভূতের বাড়ী আছে সেই বাড়ীর ভেতর যাই, যদি খাবার-টাবার পাই ত খাব, না হয় ভূতে আমায় খেয়ে ফেলবে।' এই ভেবে সে সেই ভূতের বাড়ীর ভেতরে গেল। সেখানে গিয়ে সে দেখলে যে অনেক খাবার রয়েচে। তখন সে কিছু খেয়ে সন্ধ্যের আগে একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে রইল।

.....

"অর্ধেক রাত্রে একেবারে ঝমঝম করে বাসন পড়ার মত শব্দ হল। কুকুর বেড়াল যেন ঝগড়া করতে লাগলো। খানিকক্ষণ বাদ ভিখিরীর ঘরের দরজায় দমাদম চড়, কীল, লাথি পড়তে লাগলো। খানিকক্ষণ পরে ভিখিরী আড়কাটার দিকে চেয়ে দেখলে, একটা অর্ধেক মুখ ঝুলছে, তার এক চোখ, এক কান, অর্ধেক নাক, অর্ধেক মুখ— সেটা ভিখিরীর দিকে কটমট করে চেয়ে রয়েচে। দেখতে দেখতে সেটা একটা মড়ার মত হয়ে গেলো, তারপর সেটা দড়িতে ঝুলতে লাগলো। ক্রমে মড়াটা ভুঁয়ে নামলো, ভিখিরীকে বল্লে 'আমার সঙ্গো আয়'। ভয়ে ভিখিরী ত আর ভিখিরী ছিলো না। সে আস্তে আস্তে উঠে ভূতের সঙ্গো সঙ্গো যেতে লাগলো। খানিকক্ষণ পরে এক চেঁছতলায় এলো। সেখানে ভূতেদের খাওয়া-দাওয়া হচ্ছিলো। .... মাম্‌দো তাকে দুটো হাঁড়ী দিয়ে বল্লে, 'যা তোর দুঃখ দূর হবে।' ভিখিরী তখন একটা হাঁড়ী ঝাড়লে অমনি বড় বড় সন্দেশ পড়লো, আর একটা হাঁড়ী ঝাড়লে কতকগুলো ভূত বেরিয়ে তাকে ধপাধপ মারতে আরম্ভ কল্লে। ভিখিরী তাড়াতাড়ি হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

"বাড়ী এসে ভিখিরী সন্দেশের দোকান খুলে বেশ পয়সাকড়ি করলে। একদিন রাজার বাড়ীতে কাজে তার ডাক পড়ল সন্দেশ তৈরি করবার জন্যে। সে রাজবাড়ীতে যেতে চাইলে না। নিজের বাড়ী থেকেই সন্দেশ পাঠিয়ে দিলে। এ ব্যাপারে রাজবাড়ীর একটা লোকের মনে সন্দেহ হল। সে লুকিয়ে লুকিয়ে হাঁড়ীর ব্যাপার সব জেনে নিলে। তারপর সে হাঁড়ীটা চুরি করলে। সন্দেশের হাঁড়ীটা চুরি হয়েছে দেখে ভিখিরী অন্য হাঁড়ীটা তার দোকানে বেশ সাজিয়ে রেখে দিলে আর নিজে লুকিয়ে রইল। এ হাঁড়ীটা দেখে চোরটার লোভ খুব বেড়ে গেল। 'কী আছে দেখি', মনে করে সে যেই হাঁড়ীটার মুখ খুলেছে অমনি তার সর্বাঙ্গো ধপাধপ ভূতের কিল, চড়, লাথি পড়তে লাগল। ত্রাহি ত্রাহি বলে সে সন্দেশের হাঁড়ী ফিরিয়ে দেবার পথ পায় না। তারপর থেকে আর কেউ সে হাঁড়ী চুরি করতে চেষ্টা করেনি।"

দ্বিতীয় বাংলা গল্পটি মিলেছে ইংরেজিতে, শোভনা দেবীর (ইনি রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়া ছিলেন) *The Orient Pearls* (১৯১৫) বইটিতে। লেখিকা গল্পটির নাম দিয়েছেন 'A Feast of Fists' (মানে, কিলচড়ের ভোজ)। সংক্ষেপে বলি।

> এক ছিল বামুন-বামনি। তারা খুব সৎ ও সদাচারী। কিন্তু তাদের সংসার চলে খুব কষ্টে। দারিদ্র্য-দুঃখ সহ্য করতে না পেরে বামুন একদিন বনে গিয়ে শিব-দুর্গার উপাসনা করতে লাগল। বামুনের ব্যাকুল উপাসনায় প্রসন্ন হয়ে শিবদুর্গা তাদের দুঃখ চিরকালের জন্যে দূর করবার উদ্দেশ্যে একটি বাটা দিলেন বামুনকে। বাটার ঢাকনা খুললেই যে-রকম-ইচ্ছে আর যত-ইচ্ছে সব রকম খাবার পাওয়া যাবে। বাটাটি নিয়ে বাড়ি আসবার সময় বামুন নিজের দোষে সেটি হারিয়ে ফেলে। কিছুদিন পরে শিব-দুর্গা বামুন-বামনির খোঁজ নিতে তাদের কুটিরে আসেন ছদ্মবেশে। বাটাটি চুরি গেছে শুনে তাঁরা বামুনকে আর একটি বাটা দিলেন। এ বাটা খুললেই অজস্র কিল-চড়-লাথি পড়ে ভূতের। যে চোর প্রথম বাটা চুরি করেছিল সে লোভের টানে দ্বিতীয় বাটাটিও চুরি করে। এ বাটা ফেরত দিয়ে তবে সে ভূতের মার থেকে নিষ্কৃতি পায়। তারপর আবার প্রথম বাটা চুরি গেল রাজবাড়িতে সন্দেশ সরবরাহ উপলক্ষে। সেটিও উদ্ধার করা হল যেমন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে। রাজা খুসি হয়ে বামুনকে রাজবাড়ির পুরুত নিযুক্ত করলেন।

তৃতীয় বাংলা গল্পটি দ্বিতীয় গল্পেরই সংস্করণের মতো। এটি সংগ্রহ করেছেন চকখন্‌জাদি হাইস্কুলের শিক্ষক শ্রীরফিকুল ইসলাম এম.এ। বর্ধমান জেলার রায়না থানায় দামোদর তীর অঞ্চলের লোক ইনি। গল্পটি ওই অঞ্চলেই চলিত আছে। গল্পটি আদ্যন্ত বলবার প্রয়োজন নেই। শুধু দ্বিতীয় গল্পের পার্থক্যটুকু নির্দেশ করলেই যথেষ্ট।

> ব্রাহ্মণের কাতর প্রার্থনায় দুর্গা আর্দ্রচিত্ত হয়েছিলেন, শিব হননি। দুর্গা ব্রাহ্মণকে একটি ছোট পাথরের ফলক দেন। তাতে লেখা ছিল, 'ফল্, পাথর ফল্।' এই কথা উচ্চারণ করে যা মন করবে তাই-ই পাওয়া যাবে। সেই পাথর পেয়ে খুব খুসি হয়ে ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরছে। পথে রাত কাটাতে হল শিষ্য বাড়িতে। শিষ্য সেই পাথরটি চুরি করলে। ব্রাহ্মণ মর্মাহত হয়ে আবার সেই বনে গিয়ে গাছতলায় শিবদুর্গাকে ডাকতে লাগল। তার টানে দুর্গা এলেন, শিবও অনিচ্ছাসত্ত্বেও এলেন। তার পাথর হারানো শুনে শিব বিরক্ত হয়ে দুর্গাকে ভর্ৎসনা করলেন যার তার উপর প্রসন্ন হওয়ার জন্যে। তারপর নিজে ব্রাহ্মণের কাছে এসে তাকে একটি লাঠি দিলেন। চমৎকার লাঠি। মাথা সোনায় মোড়া। তার উপর খোদাই করা আছে, এই কথা, 'মার, লাঠি মার', আর লাঠির ডগায় খোদাই করা আছে এই কথা, 'থাম, লাঠি থাম'।
>
> লাঠি নিয়ে বামুন আবার এসে সেই শিষ্য-বাড়ি উঠল। লাঠিটিকে বামুন

সন্তর্পণে নাড়াচাড়া করছে দেখে শিষ্যের লোভ হল লাঠিটিও আত্মসাৎ করতে। সে বামুনকে বল্লে, 'বাঃ বেশ চমৎকার লাঠিটি তো। কোথায় পেলেন? আবার লেখাও রয়েছে—'মার, লাঠি মার'— যেই এই কথা বলা অমনি দুড়দাড় করে লাঠি পেটা চলল শিষ্যের গায়ে। কাবু হয়ে সে পাথরটি ফেরত দিয়ে তবে নিস্তার পেলে। 'থাম, লাঠি থাম'— এই কথা বামুন বলতেই ভৌতিক লাঠিবাজি থেমে গিয়েছিল।

অল্পদিনেই বামুন বড়োলোক হয়ে গেল। তার সে ঐশ্বর্য দেখে রাজার খুব হিংসে হল। ব্রাহ্মণকে ধরে আনিয়ে রাজা তাকে দেবীর কাছে বলি দিতে চাইলে। বামুন সঙ্গো লাঠিগাছটা এনেছিল। বলি হবার আগে সে দেবীকে শেষ প্রণাম করবার অনুমতি চাইলে। রাজা সে অনুমতি দিলে। বামুন দেবীর সামনে দণ্ডবৎ উপুড় হয়ে পড়ল পাশে লাঠিগাছটা রেখে। তখন লাঠিটার উপর সকলেরই দৃষ্টি পড়ল, রাজারও। রাজা লাঠিটা দেখে তা তুলে নিয়ে তার মাথায় লেখাটা পড়লে— 'মার, লাঠি মার'। অমনি আর যায় কোথা। রাজা বেধড়ক মার খেতে লাগল। অবশেষে ব্রাহ্মণকে তুষ্ট করে প্রাণ পেলে। রাজা বামুনকে অনেক পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করলে।।

অবধী গল্পটি পেয়েছি জয়পুরিয়া কলেজের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকান্ত উপাধ্যায় এম. এ, পি-এইচ-ডি-র কাছে। গল্পটি সংক্ষেপে এই—

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ নাচার হয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে প্রায়োপবেশন করেছিল। তার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে জলনিধি কুবের তার সামনে এসে তাকে একটি শাঁখ দিয়েছিলেন। সে শাঁখে ফুঁ দিলেই অভীষ্ট বস্তু লাভ হবে। শাঁখ নিয়ে খুসি হয়ে বাড়ি আসবার সময়ে ব্রাহ্মণকে এক গ্রামে রাত্রিবাস করতে হয়েছিল। সেখানে শাঁখটি চুরি যায়। খুব কাতর হয়ে ব্রাহ্মণ আবার ফিরে যায় সমুদ্রতীরে আর তপস্যা করতে থাকে। দেবতা আবার তাকে দেখা দিয়ে আগেকার থেকে বড়ো একটি শাঁখ দেন। দিয়ে বলেন যে, এ-শাঁখে জোরে ফুঁ দিতে দিতে যা বলবে তার দ্বিগুণ পাবে। ব্রাহ্মণ শাঁখটি নিয়ে জোরে ফুঁ দিয়ে দেখলে, কিছুই হল না। তবে সে যা বললে তা জোরে প্রতিধ্বনিত হল। ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান। সে বুঝলে দেবতা তাকে এ শাঁখ দিয়েছেন আগের শাঁখটি ফিরে পাবার ফন্দি করে।

শাঁখ নিয়ে ঘরে ফেরবার সময়ে সে পথে আবার রাত কাটাতে উঠল সেই বাড়িতে, যেখানে তাঁর শাঁখ চুরি হয়েছিল। এবারে বামুনের হাতে আর একটা বড়ো শাঁখ দেখে গৃহস্বামীর লোভ খুব বেড়ে গেল। সে করলে কি, বামুন যখন ঘুমোবার ভান করে শুয়ে পড়ল, তখন সে আস্তে আস্তে এসে আগেকার শাঁখটি রেখে দিয়ে বড়ো শাঁখটি নিয়ে গেল। সে যাবার পরেই

ব্রাহ্মণের যেন ঘুম ভেঙে গেল। তারপর সে সারারাত বসে কাটালে। ভোর হতেই সে ঘরের দিকে রওনা হল। বামুন চলে যেতেই চোর গৃহস্বামী নিশ্চিন্ত হয়ে বড়ো শাঁখে ফুঁ পাড়লে—একবার দুবার তিনবার বারবার। কোনবারেই কিছুই হল না, কেবল হল দীর্ঘ প্রতিধ্বনি। সাধারণ শাঁখ তো। দেবতার কথা রইল। বামুন তার হারাধন ফিরে পেলে। অতিলোভী চোর ঠকে গেল।

তুর্কি গল্পটি— মনে হয় আর্মেনিয় ভাষা থেকে নেওয়া— সংগ্রহ করে ইংরেজিতে প্রকাশ করেছিল হাঙ্গেরীয় পণ্ডিত ইগনাজ কুনোস (Ignacz Kunos) *Fortyfour Turkish Fairy Tales* বইটিতে (মুদ্রণ কাল দেওয়া নেই)। গল্পটির নাম 'Mahomet, the Baldhead' (অর্থাৎ 'টেকো মহমৎ')।

একটা ছেলে ছিল। তার মাথায় চুল খুব কম ছিল বলে লোকে তাকে ডাকত টেকো বলে। একদিন সে কুয়োর ধারে বসে কলাই-সেদ্ধ খাচ্ছিল। খেতে খেতে একটা কলাইদানা তার হাত ফসকে কুয়োর মধ্যে পড়ে যায়। তাতে সে খুব বিরক্ত হয়ে চেঁচামেচি করতে থাকে। কুয়োর দিকে চেয়ে বার বার বলতে থাকে, 'এখনি আমার কলাইদানা ফেরত চাই।'

অবশেষে তার হাঁক-ডাকের ফলে কুয়োর মধ্য থেকে একটা আরব ভূত (অর্থাৎ জিন) উঠে এল। সে এসে টেকোকে একটা দৈব (magic) টেবিল দিলে। বললে যে, সে যখন যা খেতে মন করবে, তখনি টেবিল পাতলে তা পেয়ে যাবে। সে টেবিল চুরি গেল। আবার টেকো কুয়োর ধারে এসে চেঁচাতে লেগে গেল। আবার জিন কুয়ো থেকে উঠে এল। এবার সে দিলে একটা জাঁতা। সে জাঁতাও গেল চুরি। তারপর জিন তাকে দিলে একটা লাঠি। সেই লাঠি চোরকে জব্দ করলে। তার টেবিল ও জাঁতা সে ফিরে পেলে।।

ইংরেজি গল্পটি কিছুটা পুষ্টকায় ও ছিমছাম। এটি পেয়েছি জেমস রীভসের (James Reeves) *English Fables and Fairy Stories* থেকে (১৯৫৪)। গল্পটির নাম The Donkey, the Table and the Stick (অর্থাৎ খচ্চর, টেবিল ও লাঠি।)

গল্পটি বলি।

ভালো মানুষ বোকাসোকা একটি ছেলে। নাম রবিন। বাপের কাছে সে ভর্ৎসনা লাঞ্ছনা ছাড়া কিছু পেত না। তাদের গাঁয়ে এক বিধবা ছিল। একটি মেয়ে ছাড়া তার আর কেউ ছিল না। মেয়েটির নাম মার্গারেট। রবিন তাকে ভালোবাসত। ইচ্ছে ছিল তাকে বিয়ে করবে। কিন্তু তার বাবার মত ছিল না।

একদিন রবিন বাড়ি ছেড়ে চলে গেল বিদেশে নিজের অদৃষ্ট ফেরাতে। যাবার সময় সে মার্গারেটকে বলে গেল যে, বৎসর খানেকের মধ্যেই সে

ফিরে আসবে। পথে যেতে যেতে সে দেখা পেলে এক বুড়ির। বুড়ি জঙ্গালে কাঠ কুড়ুচ্ছিল। রবিন তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল। রবিনকে দেখে বুড়ির মায়া হল। সে তাকে চাকর করে বাড়িতে নিয়ে গেল। প্রায়ে এক বছর রবিন বুড়ীর ঘরে খাটল। তারপর সে মাইনে চুকিয়ে নিয়ে বাড়ি যেতে চাইলে বুড়ি তাকে মাইনে বলে দিলে এক খচ্চর (donkey) । তার বিশেষ গুণ এই যে তার এক কান ধরে টান দিলে টপ টপ করে সোনার মোহর পড়ে, অন্য কান টানলে ঝনঝন করে রুপোর টাকা পড়ে।

মাইনে নিয়ে রবিন বাড়ি-মুখো হল। পথে সে আশ্রয় নিলে এক সরাইখানায়। সেখানে তার জন্তুটি চুরি হয়ে গেল। তখন রবিন চলল উলটোমুখে আবার রোজগারের চেষ্টায়। এবারে তার কাজ জুটল ছুতোরের ঘরে। কিছুদিন সেখানে কাজ করে রবিন বাড়ি যেতে চাইলে ছুতোর খুসি হয়ে তাকে দিলে একটা টেবিল। সে টেবিলের সামনে বসে, 'চাকা খোল তো', এই কথা বললেই নানারকম সুখাদ্য প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত হবে। টেবিল নিয়ে রবিন আনন্দমনে ঘরের দিকে চলল। কিন্তু আবার সে উঠল সেই সরাইখানায়। আর সেখানে তার টেবিল চুরি গেল।

হতাশ হয়ে রবিন কাজের চেষ্টায় উলটো রাস্তা ধরলে। পথে যেতে যেতে দেখলে যে একটা লোক এক নদীর এপারে থেকে ওপারে যাবার জন্যে পুলবন্দী পথ তৈরি করতে চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। রবিন করলে কী, না—এপারের এক উঁচু গাছে চড়ে তার ডগায় উঠে ডগার ডাল ধরে দিলে এক লাফ। সে ওপারে গিয়ে পড়ল, হাতে ধরা আছে তার ওপারের গাছের মগ ডাল। সেই ডাল সে বেঁধে দিলে এপারের এক গাছের সঙ্গো। চমৎকার পুল বাঁধা হয়ে গেল। লোকটি খুসি হয়ে রবিনকে বখশিশ করলে একটি লাঠি। লাঠিটির বিশেষ গুণ হল এই যে, হুকুম দেওয়া হলেই সে লাঠি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে পিটিয়ে শেষ করে দেবে।

লাঠি নিয়ে রবিন ফিরতি পথে সেই সরাইখানায় এসে উঠল। রাত্তিরে সে ঘুমোল না, সজাগ রইল। যেই সরাইখানার কর্তা লাঠি চুরি করতে এসেছে অমনি সে লাঠিকে হুকুম দিলে পেটাবার। মারের চোটে সরাইখানার কর্তা রবিনকে তার জন্তু ও টেবিল ফেরত দিতে বাধ্য হল। রবিন বাড়ি ফিরে এসে মার্গারেটকে বিয়ে করলে।।

আগেই বলেছি ছটি গল্পের মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র আছে। তা হল দুঃস্থ ব্যক্তির দৈব অনুগ্রহে ধন লাভ, সে ধন হারানো; শেষে দৈবানুগ্রহে তা ফিরে পাওয়া। এই সূত্রটিতে বেঁধে নিয়ে গল্পগুলিকে কোনো একটি মূল গল্পে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা, তা

এখন আমাদের বিচার্য। গল্পগুলির মধ্যে অমিলও বেশ আছে। সে অমিলগুলি আগে বিচার করতে হবে।

অমিল ধরতে গেলে প্রথমেই আলাদা করতে হয় অবধী গল্পটিকে। গল্পটির ছাঁদ বেশ স্বাভাবিক। শাঁখে ফুঁ দেওয়া মোটিফটি বেশ সরস। এতে চোরের শাস্তি নেই। চোর এখানে নিজেই বোকা বনে গেছে শাঁখ বদল করে। এ গল্পটির উৎপত্তি যে আমাদের দেশে তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই। কল্পবৃক্ষের ও চিন্তামণির আইডিয়া থেকে বিচিত্র শক্তিশালী মানিকের (আর তার থেকে অনুরূপ দ্রব্যের) মোটিফ এসেছে। এরকম গল্পের বাংলায় বোধ করি প্রথম নমুনা পাচ্ছি কেরির ইতিহাস-মালায় (ফাদার দ্যতিয়েন সম্পাদিত পৃষ্ঠা ৭২)। গল্পটি এই—

> এক ছিল অন্ধ দম্পতি। তাদের একটি মাত্র সন্তান, শিশু পুত্র। সে ভিক্ষা করে ও বনজঙ্গল থেকে ফলমূল কুড়িয়ে এনে বাপমাকে পোষণ করত। বড়ো হয়ে একদিন সে বনে গিয়ে সারাদিন ঘুরে কিছুই পেলে না। ঘরে ফিরতে গিয়ে দেখে যে অন্ধকার হওয়ায় পথ খুঁজে পাচ্ছে না। হতাশ হয়ে সে এক গাছতলায় বসে কাঁদতে লাগল। ওই বনে এক মহাপুরুষ থাকতেন। তিনি তাঁর কান্না শুনে এসে সান্ত্বনা করেন ও একটি মানিক দেন। বলে দেন যে, সে মানিকের কাছে যা চাইবে তাই পাবে।
>
> ছেলেটি বাড়ি এসে মানিকের কাছে প্রথমে চাইলে তার বাপ-মায়ের দৃষ্টিশক্তি লাভ ও শারীরিক সুস্থতা। তারপর চাইলে যথোপযুক্ত টাকাকড়ি।।

প্রথম নজরেই গল্পগুলিকে দু ভাগে ভাগ করা যায়— দেশি ও বিদেশি। দেশি থাকে পড়ে অবধি গল্পটি আর বাংলা গল্প তিনটি। বিদেশি থাকে পড়ে তুর্কি ও ইংরেজি গল্প দুটি। এই দু-থাকের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায় নায়কের বেলায়। দেশি গল্প চারটিতে নায়ক দুঃস্থ দুর্গত। বিদেশি গল্প দুটিতে নায়ক দুঃস্থ নয়, তবে কিছু বিপন্ন। দেশি গল্পগুলিতে নায়ক দান পেয়েছিল একবার, একটি ; বিদেশি গল্প দুটিতে দুবারে, দুটি। এ পার্থক্যের কারণ পরে বলছি।

যদি দয়ালু শক্তি বা দাতার দিকে নজর রাখি তা হলে গল্প ছটিকে তিন স্তবকে ভাগ করতে হয়। প্রথম স্তবকে পড়ে অবধী গল্পটি আর বাংলা দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্প দুটি। এ তিনটি গল্পে দয়ালু শক্তি হলেন উপাস্য দেবতা। দ্বিতীয় স্তবকে পড়ে প্রথম বাংলা গল্পটি আর তুর্কি গল্পটি। এ দুটি গল্পে দয়ালু শক্তি হল অপদেবতা, ভূত। (মনে হয় ইসলামপ্রভাবিত এ গল্প দুটিতে স্বাভাবিক কারণেই দেবতা অপদেবতায় পরিণত হয়েছে। আর তৃতীয় স্তবকে পড়ে ইংরেজি গল্পটি। এখানে দেবতা অথবা অপদেবতা নয়, মানুষ। আর নায়ক দান পেয়েছে প্রার্থনার জোরে অথবা কান্নাকাটির চোটে নয়, নিজের পরিশ্রমের ও বুদ্ধির মূল্য হিসাবে।

আরও একনজরে দেখলে গল্পগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। এক ভাগে পড়বে

প্রথম বাংলা গল্পটি ও অবধী গল্পটি। এ দুটি গল্পে আহার-ওষুধ (অর্থাৎ প্রাপ্তি ও পুনঃপ্রাপ্তি) একই রকম। তবে দুটি গল্পের মধ্যে একটু ক্ষীণ পার্থক্যও আছে। বাংলা গল্পে আহার ও ওষুধ এক সঙ্গো বিতরণ করা হয়েছিল, আর অবধী গল্পে আহারের পরে দ্বিতীয় দফায় ওষুধের ব্যবস্থা হয়েছিল। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে বাকি চারটি গল্প। সেখানে অবধী গল্পের মতো আহারে গণ্ডগোল হলে পর তবে ওষুধের ব্যবস্থা হয়েছিল।

দু-একটি গল্পের সম্বন্ধে আরও কিছু বলবার আছে।

প্রথম বাংলা গল্পটি এদেশে মানে বাংলা দেশে গড়া হলেও এর কিছু কিছু মালমশলা অন্য অঞ্চলের বলে বোধহয়। ভূতের রাজা মামদো দেশে মুসলমানদের আধিপত্য বোঝাতে পারে। তা হলে গল্পটি হয় অন্তত দুশো বছরের পুরানো। আধখানা মুখ আধখানা নাক একটা চোখ— এমনি অর্ধমূর্তি উত্তর প্রদেশ ও পঞ্জাব অঞ্চলের গল্প-কথায়ই প্রচলিত আছে। বাংলায় এমন মোটিফ একবারেই নেই। সুতরাং গল্পটি বাংলা দেশের বাইরে থেকে আমদানি হওয়া সম্ভব। তুর্কি গল্পটির উপক্রম অন্য গল্প থেকে নেওয়া বলে মনে হয়। বাংলায় যে পিঠে গাছের গল্প আছে সে গল্প হয়তো তারই মতো ছিল।

তুর্কি গল্পে জাঁতা আর ইংরেজি গল্পে খচ্চর অতিরিক্ত সংযোজন বলে মনে হতে পারে। সে সংযোজনের কারণ আছে। বাংলা গল্প তিনটিতে বস্তুটি দুবার চুরি যাওয়ার বদলে দুটি বস্তু চুরি যাবার কথা রয়েছে। সুতরাং হরেদরে একই কথা হল।

সাহিত্যে শিশু, শিশুর সাহিত্য

১. *সাহিত্য ও শৈশব*

গল্পারম্ভের আগে 'গল্প' শব্দটির ইতিহাস বলি।

শব্দটি বাংলা এবং আধুনিক, নিতান্ত আধুনিক। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে শব্দটির ব্যবহার পাইনি ছাপায়। তবে মুখে-মুখে যে চলত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-চলার ইতিহাসও ও-শতাব্দীর মোড়ের আগে পৌছবে না। এবং তখন শব্দটি প্রচলিত ছিল 'গপ্‌প' রূপে। গপ্‌প শব্দ ফারসি। মানে বিশ্রম্ভ-আলাপ, টুকিটাকি কথাবার্তা। এই শব্দঘটিত বিশেষ বাক্যাংশও চলিত ছিল ফারসিতে 'গপ্‌প- ও-শপ্‌প'। এ-বাক্যাংশটিও বাংলায় চলে এসেছে 'সপ্‌প'-রূপে। গল্পের মতো বাক্যাংশটিও সংস্কৃতায়িতরূপে পৌঁছেছে 'গল্প-স্বল্প'রূপে। এ-রূপটিকে চিরস্থায়ী করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে লেখা তাঁর জীবনকথা বইয়ের নাম দিয়ে। 'গল্প' কথাটিকেও রবীন্দ্রনাথ চালু করেছিলেন তাঁর প্রথম গল্পসংগ্রহগুলির নামে স্থান দিয়ে—'ছোটগল্প', 'গল্প', 'গল্পগুচ্ছ' ইত্যাদি নাম দিয়ে। তাঁর এই প্রয়োগের আগে সাহিত্যে গল্পের নাম ছিল 'উপন্যাস' ও 'কাহিনী'। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বড়ো গল্পগুলিকে নির্দেশ করেছেন 'ক্ষুদ্র উপন্যাস' বলে। ইংরেজিতে লেখা শশীচন্দ্র দত্তের গল্পগুলির বাংলায় অনুবাদ বেরোয় ১৮৭৭ সালে 'উপন্যাসমালা' নামে।

সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প উপন্যাসের নাম ছিল—'আখ্যান', 'আখ্যায়িকা', 'উপাখ্যান', 'ইতিহাস', এবং 'কথা'। প্রথম শব্দ তিনটি আ। খ্যা ধাতু তার থেকে উৎপন্ন। শব্দগুলির ধাতুগত অর্থ হল বিশদ করে, বড়ো করে বর্ণনা। সাধু ভাষার তরঙ্গে এ-শব্দগুলিও গল্প-উপন্যাসের প্রতিশব্দরূপে বাংলায় এসেছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। তবে শব্দগুলি শতাব্দীর প্রথমদিকে গল্প উপন্যাসের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হলেও, শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে এগুলি ঐতিহাসিক ও বাস্তব বর্ণনাই নির্দেশ করত। যেমন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য 'পদ্মিনীউপাখ্যান', বিদ্যাসাগরের 'আখ্যানমঞ্জরী' ইত্যাদি। তবে উপন্যাস অর্থেও যে একেবারে ব্যবহৃত হত না, তা নয়। যেমন, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের 'সুশীলার উপাখ্যান'।

'ইতিহাস' শব্দটি সবচেয়ে প্রাচীন। বৈদিক গদ্য-সাহিত্যের শেষ ভাগ থেকে পাওয়া যায়। 'ইতি হ আস পুরাণম্‌'—'এইরকমই ছিল সে কালে',—এই বাক্যটি সংক্ষিপ্ত হয়ে দুটি শব্দে দাঁড়িয়ে যায়,—'ইতিহাস' আর 'পুরাণ'। শব্দ দুটির মানে হয় যথাক্রমে 'সত্যগল্প' আর 'পুরাণকথা'। যেমন 'মহাভারত'—ইতিহাস আর 'হরিবংশ'—

পুরাণ। বাংলায় 'ইতিহাস' শব্দটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে 'উপাখ্যান' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। যেমন গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে রামায়ণ কাহিনী অংশকে বলা হয়েছে 'ধর্ম-ইতিহাস'। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম তিরিশ-চল্লিশ বছর ধরে শব্দটি 'গল্প' অর্থেই বেশি চলত। যেমন, 'ইতিহাসমালা', 'আরবীয়-ইতিহাস', 'তুরকীয়-ইতিহাস' ইত্যাদি। ১৮৫০ সালের আগে থেকেই শব্দটির এ-অর্থে ব্যবহার ঘুচে যায় এবং শব্দটির স্থান নেয় এক সংস্কৃত শব্দ নতুন অর্থে 'উপন্যাস'। যেমন'আরব্য-উপন্যাস', 'তুরস্ক উপন্যাস', 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' ইত্যাদি।

ইংরেজি নভেল (Novel) বাংলায় গল্প কাহিনী অর্থে উপন্যাস হিসেবে নামকরণ করেছিলেন কে তা বলতে পারি না। তবে শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়েছিল ১৮৫২ সালের আগেই। শকুন্তলায় কালিদাস রাজার মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন, 'কিম্ ইদম্ উপন্যাস্তম্?'' (—'এসব কি আরোপ করা হচ্ছে?')। এই উক্তিটিতেই উপন্যাস শব্দের জন্মবীজ নিহিত। এখন বাংলায় উপন্যাস শব্দটি ইংরেজি Novel ও Fiction -এর সমার্থক। ইংরেজি Story (short story) বোঝাতে বাংলায় গল্প (ছোট গল্প) শব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শব্দটির প্রতিষ্ঠার কথা আগেই বলেছি।

গল্পের যথার্থ প্রতিশব্দ সংস্কৃতে 'কথা'। শব্দটি বেদে নেই, বেদের পরবর্তী কাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে। শব্দটির ইতিহাস বড়ো মজার। 'কিম' শব্দে 'থা' প্রত্যয় যোগ করে এই বৈদিক অব্যয় পদটি নিষ্পন্ন। অর্থ হল, কেমন করে? কিসে? তারপর? এর অনুরূপ পদ হল 'যথা', 'তথা', 'সর্বথা', 'অন্যথা' ইত্যাদি। পদটির বিশেষ্যরূপে প্রথম ব্যবহার হয়েছিল 'কথোপকথন' অর্থে। সেই অর্থ থেকে দাঁড়িয়ে যার 'গল্প'। (কেননা গল্প শোনবার সময়ে শ্রোতা আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করে, 'কি করে হল?' 'তারপর?') গল্প অর্থে প্রয়োগ কালিদাসের মেঘদূতে আছে,—

প্রাপ্তোবন্তীন্ উদয়ন কথা কোবিদ্ গ্রামবৃদ্ধান্ 'অবন্তী দেশে পৌছে, যেখানে গ্রামের বুড়ো লোকেরা উদয়নের গল্প খুব ভাল করে জানে।....'

বাংলায় গল্প অর্থে কথা শব্দের অল্প চলন ছিল বর্তমান শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত। যেমন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'নবকথা'। 'কথা' (কথানিকা) থেকে উৎপন্ন 'কাহিনী' শব্দটির চলন 'কথা'-র চেয়ে কিছু বেশি ছিল। রবীন্দ্রনাথ কথা ও কাহিনী দুটি শব্দই ব্যবহার করেছেন গ্রন্থ নামে, তবে গদ্যগল্পে নয়।

দুই

ভাষা ও সাহিত্য প্রায় সমজন্মা। নিতান্ত এবং অব্যবহিত প্রয়োজন ছাড়া ভাষার ব্যবহার হলে তা সাহিত্যের আওতায় পড়ে। এখানে মনে রাখতে হবে, আমি যে সাহিত্যের কথা বলছি, তা লিপির উদ্ভবের অনেক কাল আগের কথা, মানুষের ইতিহাসের প্রায় গোড়াকার কথা। এখানে 'সাহিত্য' মানে 'সাহিত্যভাব'। মানুষ জন্মেই ভাষা পেয়েছে, আর ভাষা পেয়েছে বলেই সে মানুষ হয়েছে। ধ্বনির সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করাই হল ভাষার ধর্ম ও কর্ম। গোড়ার দিকে মানুষের ভাষায় প্রায়

একমাত্র ব্যবহার ছিল দৈহিক ও মানসিক অনুভূতি তীব্র হলে তার প্রকাশ এবং সে প্রকাশের প্রতিক্রিয়া অনুধাবন। এ হল প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহার।

অনতিবিলম্বে প্রত্নমানুষের কানে ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনির ঝঙ্কার কোনো মানে বহন না করলেও মনকে ঠাণ্ডা করতে পারত, বিশেষ করে শিশুর প্রতি প্রযুক্ত হয়ে। মধুর শব্দ করে মন ভুলিয়ে অথবা ভীষণ চিৎকার করে ভয় দেখিয়ে শিশুকে ঘুম পাড়ানো অথবা বশে রাখা বোধ করি ভাষার—ঠিক ভাষার নয়, প্রত্নভাষার—প্রথম নিষ্প্রয়োজনে ব্যবহার। এরই সঙ্গে সঙ্গে দলপতির নিরর্থ শব্দপ্রয়োগ করে অধীনস্থদের ভয় দেখিয়ে বশে রাখা অথবা মন ভুলিয়ে ব্যথাবেদনা সরিয়ে দেওয়া—এই প্রাথমিক রোজার কাজের উৎপত্তিও এই সময়ে এবং এইভাবে। নিষ্প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারের প্রথম 'সাহিত্য' ফল হল অর্থহীন ধ্বনি ঝঙ্কারের মন্ত্ররূপে ব্যবহার। ক্রমশ এমন ধ্বনিঝঙ্কারে একটু একটু করে অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগল। তখন ছড়ার সৃষ্টি হল। মানুষের ইতিহাসে প্রথম সাহিত্যবস্তু। ধ্বনিঝঙ্কারের সাইকেলে চড়ে বাগর্থ দ্রুতবেগে ধাবিত হল উন্নতির অভিসারে। সাহিত্যের প্রথম শাখা কবিতা উদ্‌গত হল।

দ্বিতীয় সাহিত্যবস্তু গল্পও খুব পেছিয়ে থাকেনি। তবে গল্প ছড়ার মতো ধ্বনিসর্বস্ব নয়, অর্থসর্বস্ব। সেই কারণে ভাষা কিঞ্চিৎ সরল হলে পরে তবেই গল্পের উদ্‌গম হয়েছিল। ছড়ার মতোই গল্পের সৃষ্টি হয়েছিল ঘরোয়া প্রতিবেশে, তবে তখন শিশু ও বয়স্ক মানুষের মনের গড়নে এখনকার মতো এত তফাত ছিল না। যে-গল্প শিশুর মন ভোলাত তা বয়স্কেরও মন ভোলাত। তবে গোড়ার দিকে গল্প বলে ছেলে ভোলানো হত বলে মনে হয় না। মনের মধ্যে যেটুকু শান্তি ও স্বচ্ছন্দতা নিয়ে মা-দিদিমারা ছেলেমেয়েকে গল্প শুনিয়ে ভুলিয়ে রাখতে পারেন, তেমন অবস্থা মানুষের ইতিহাসের গোড়াকার দিকে কল্পনা করা যায় না। সে কাজে তখন ছড়া-ই পর্যাপ্ত ছিল।

তবে একথা ঠিক যে, গোড়ার দিকে গল্পের কাজ ছিল মন ভোলানো,—মুগ্ধ করা নয়, হালকা করা, নতুন কাজে আগ্রহ জন্মানো। এই পথেই সব দেশের—যেসব দেশে সাহিত্য প্রাচীন কাল থেকে ধারাবাহিক ভাবে চলে এসেছে, সেসব দেশে—গল্প নীতি-উপদেশের কাজে অর্থাৎ প্রিমিটিভ সত্য ধর্মের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। এবং সেই সূত্রেই স্থায়ী সাহিত্যে গল্পের অভিযান।

আমাদের দেশে সাহিত্যের ইতিহাস একটানা প্রায় তিন হাজার বছর চলে এসেছে। আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে এদেশে ইন্দো-ইউরোপীয়ভাষী একদল ইন্দো-ইরানীয় গোষ্ঠীর লোক ইরান থেকে ভারতবর্ষে এসে এখানে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন, এদেশে চাষ-আবাদ আশ্রয় করে। সেই আমাদের ভারতীয় ভাষার ইতিহাস শুরু।

আমাদের প্রথম সাহিত্যগ্রন্থ 'ঋগ্‌বেদ'। এটি একটি 'চয়নিকা' বা সংকলনগ্রন্থ, দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত কবিতাস্তবের সংগ্রহ। কবিতাগুলির রচনাকাল মোটামুটি

১০০০ থেকে ৭০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ। সংকলনকাল ৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি। ঋগ্‌বেদের কোনো কোনো কবিতাস্তবে গল্পের টুকরো ছড়িয়ে আছে। এমনি একটি টুকরো পাই শূনঃশেপের স্তবে (প্রথম মণ্ডলে চব্বিশ সূক্ত)। গল্পের এইটুকু বোঝা যায় যে, এক বা একাধিক ছেলেকে ঘর থেকে কিনে হোক, চুরি করে হোক এনে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সে কাতরভাবে বলছে—

কস্য নূনং কতমস্যামৃতানাং
মনামহে চারু দেবস্য নাম।
কো নো মহ্যা অদিতয়ে পুনর্দাৎ
পিতরং চ দৃশেয়ং মাতরং চ ।।১।।

'অমরদের মধ্যে কার কোন্ দেবতার সুন্দর নাম স্মরণ করি এখন? কে আবার আমাদের ফিরিয়ে দেবে বুড়োমা অদিতির কোলে? বাবাকে আর মাকে আবার যাতে দেখতে পাই।'

ঋগ্‌বেদের কবির কাছে গল্পটির গুরুত্ব কতখানি ছিল তা বলবার উপায় নেই। তবে খুব বড়ো করে গল্পটি পাওয়া যাচ্ছে ঋগ্‌বেদীয় ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে 'শূনঃশেপ' আখ্যানে। এ-গল্পে অনেক বাইরের বস্তু জোড়া হয়েছে। গল্পটি ভারতীয় সাহিত্যে আখ্যান-আখ্যায়িকার প্রথম এবং ভালো নিদর্শন। গল্পটি এইখানেই থেমে ছিল না। পরবর্তীকালে পুরাণ কাহিনীতে গল্পটি বিশ্বামিত্র-হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যানে নতুন রূপ পেয়েছে। তার সঙ্গো বৈদিক গল্পটির হরিশ্চন্দ্র ও তার পুত্রের নাম ছাড়া আর কোনো মিল নেই।

ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের একটি কবিতা দেবী অরণ্যানির স্তব (১৪৬)। এই দেবতার কথা অন্যত্র কোথাও নেই, না ঋগ্‌বেদে না অন্য বেদে, না পুরাণে (স্পষ্ট করে), না সংস্কৃত সাহিত্যে। আছে মধ্য বাংলা সাহিত্যে (চণ্ডীমঙ্গালে কালকেতুর উপাখ্যানে) এবং আধুনিক বাংলা ছেলে ভুলোনো গল্পে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বাংলা দেবী-কাহিনীর সুস্পষ্ট ছায়া মিলেছে জার্মান গল্পে, অস্পষ্ট অথচ অভ্রান্ত ছায়া পড়েছে দুটি ইরানীয় গল্পে ও একাধিক আর্মানি গল্পে। সাহিত্যের বাগানে গল্পবৃক্ষের বীজ যতটা দূরে ছাড়ায় এমন কাব্যবৃক্ষের বীজ নয়। শুধু কাহিনীর বীজের প্রাচীনত্বই নয়, সে-বীজের পর্যটন ক্ষমতারও পরিচয় এখানে পাচ্ছি। এ বিষয়ে আমি একদা অন্যত্র বিস্তারিত লিখেছিলুম। এখন অল্প কথায় বলছি।

অরণ্যে আশ্রয়দাত্রী দেবী ছাড়া কালকেতু-উপাখ্যানের সঙ্গো বৈদিক স্তবের ও আধুনিক গল্পগুলির কোনোই মিল নেই। শুধু বাংলা ও জার্মান-প্রান্তিক গল্প দুটির আলোচনা করি।

প্রথমে বাংলা গল্পের কথা বলি। গল্পটির তিনটি পাঠ আমার জানা আছে। একটি লালবিহারী দে-র, আর একটি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের, আর একটি র‍্যালফ্ ট্রোগেরের (Ralf Troger) সংগ্রহ। শেষের সংগৃহীত পাঠে শেষের দিকে অন্য একটি বিদেশি গল্পের সংযোগ আছে। গল্পটি এক প্রাচীন মুসলমান মহিলার মুখে

শোনা। এ-পাঠের সঙ্গে ইরানে প্রাপ্ত কোনো গল্পের মিল দেখা যায়। আমার এ-আলোচনায় এ-পাঠ বাদ দিলুম।

লালবিহারী দে-র গল্প (The Bald Wife) :

একটি লোকের দুটি বিবাহ। প্রথম পত্নী দুয়ো, তাঁর মাথায় প্রচণ্ড টাক। লোকটি বিদেশে গেছে। সেই সুযোগে সুয়ো ছোট বউ তার দুয়ো সতীনকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে। অছিলে হল উকুন বাছা নিয়ে। সুয়োর মাথায় উকুন বাছতে গিয়ে দৈবাৎ দুয়ো দু'গাছা চুল ছিঁড়ে ফেলেছিল। এই অপরাধ। যাবার কোনো স্থান না থাকায় দুয়ো বনের দিকে চলল। যেতে যেতে সে পথের ধারে দেখলে কাপাসগাছ ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে যেন শুকিয়ে আছে। সে গিয়ে পরিষ্কার করে দিলে। তারপর খানিক এগিয়ে গিয়ে একটা কলাঝাড় দেখলে তেমনি দুরবস্থায়। সে তার তলা পরিষ্কার করে দিলে। আরও এগিয়ে দেখতে পেলে অপরিচ্ছন্ন গোয়াল, পরিষ্কার করে ষাঁড়কে জাব দিলে। তারপরে এল এক অপরিচ্ছন্ন তুলসীতলায়। সে তুলসীতলা পরিষ্কার করে দিলে। তারপর সে পৌঁছল এক কুটিরের কাছে। কুটিরের সামনে এক মুনি ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছেন। মুনির ধ্যান ভাঙার অপেক্ষায় দুয়ো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মুনির ধ্যান ভাঙলে পর তাঁর দৃষ্টি মেয়েটির উপর পড়ল। তিনি তার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলে সে সব খুলে উত্তর দিলে। মুনি শুনে বললেন, 'সামনের ওই পুকুরে গিয়ে ডুব দিয়ে এস।' সে তাই করলে। পুকুর থেকে উঠে দেখলে তার এক মাথা কালো চুলের রাশ হয়েছে। তারপর মুনি তাকে বললেন, কুটিরের মধ্যে গিয়ে পছন্দ মতো যে-কোনো একটি ঝাঁপি গ্রহণ করতে। কুটিরে ঢুকে দুয়ো সবচেয়ে ছোট ঝাঁপিটি তুলে নিলে। তার মধ্যে ছিল সোনাদানা মণিমুক্তার প্রচুর গয়না। বাড়ি ফেরবার পথে সে ষাঁড়ের কাছে আসতে সে পেলে ষাঁড়ের শিংয়ের একজোড়া চমৎকার শাঁখা। তারপর কলাগাছের কাছে পেলে একটি পাতা যাতে সে চিরকাল অক্ষয় ভাত-তরকারি পাবে। কাপাস-গাছের কাছে আসতে কাপাসগাছ দিলে একটি ডাল, যে-ডাল ঝাঁকালে অজস্র ভালো কাপড়চোপড় পড়বে।

এইভাবে সে বাড়ি ফিরে আবার ঘরের গিন্নি এবং স্বামীর সুয়ো হল।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের গল্প এই রকমই, তবে তার কাঠামোয় কিছু তফাত আছে। সে-তফাতটা ঘনিষ্ঠভাবে মেলে জার্মান গল্পের সঙ্গে। (জার্মান গল্পের প্রভাব পড়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। দক্ষিণারঞ্জন গল্পটি সংগ্রহ করেছিলেন অন্তত পঁচিশ-তিরিশ বছর পরে। তখন গ্রিমের গল্প অনেকেরই পরিচিত হয়ে পড়েছে। লালবিহারীর গল্প খাঁটি দেশি গল্প। তবে দক্ষিণারঞ্জনের গল্প জার্মান গল্পের আরও ঘনিষ্ঠ।)

এ-গল্পেও দুয়ো-সুয়ো। তবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাদের দুজনের মেয়েদের নিয়েই। বড়ো বউ দুয়োর মেয়ে দুখু রোদে তুলো শুখোনো হচ্ছিল সেখানে পাহারা দিচ্ছিল। হঠাৎ দমকা হাওয়া এসে খানিকটা তুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল। মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে

উড়ন্ত তুলোর পেছন পেছন চলল। যেতে যেতে সে ডাক শুনে গোরুর গোয়াল পরিষ্কার করে দিলে, কলাগাছের তলা জঞ্জালমুক্ত করলে, শেওড়াগাছের ডাল থেকে লতাপাতা ছাড়িয়ে দিলে, এক অভুক্ত ঘোড়াকে খাবার দিলে, তারপরে পৌঁছল এক চুনকাম-করা বড়ো বাড়িতে। সে বাড়ির সামনে উঠোনে বসে চাঁদের মা বুড়ি সুতা কাটছিল। দুখু বুড়ির কাছে গিয়ে তার হারানো তুলোর কথা বলতে বুড়ি তাকে অতিথিরূপে স্বাগত করলে। তারপর তাকে বললে পুকুর থেকে দুটো ডুব দিয়ে আসতে, আর তারপর বাড়ির মধ্যে ঢুকে খাবার খেতে। স্নান করে উঠে সে খুব সুন্দরী মেয়ে হয়ে গেছে। তারপর বাড়িতে ঢুকে অনেক খাবার দেখলে কিন্তু সে সামান্য কিছু খেলে। তারপর বুড়ির অনুরোধে উপহারস্বরূপ একটা ছোট পেঁড়া নিলে। তারপর বুড়ির কাছে তুলো নিয়ে বাড়ি চলল। ফেরবার পথে ঘোড়া তাকে দিলে একটা মদ্দা ছানা, শেওড়াগাছ দিলে একঘড়া ধন, কলাগাছ দিলে এক কাঁদি সোনার ফল আর গোরু দিলে একটা বাছুর। বাড়ি এসে পেঁড়া খুলে দেখে তার বর রয়েছে। তার সঙ্গো দুখুর বিয়ে হল।

সতিনের মেয়ের এমন ঐশ্বর্যলাভ ও পতিলাভ দেখে সুয়ো বউ তার মেয়ে সুখুকেও ওই রকম উড়ন্ত তুলো পিছু-পিছু ধাওয়া করালে। যেতে যেতে সুখু গোরু, কলাগাছ, শেওড়াগাছ, ঘোড়া—কোনোদিকে দৃকপাত করলে না, কারো ডাক শুনলে না। বুড়ি দুটো ডুব দিতে বলেছিল, ও দিলে তিনটে ডুব। তাতে ওর দেহ কিম্ভুতকিমাকার হয়ে গেল। উপহার নেবার বেলায় সে সবচেয়ে বড়ো পেঁড়াটা নিলে। বাড়ি এসে যখন সে-পেঁড়া খোলা হল, তখন তার থেকে বেরোল এক অজগর। সে সুখুকে গ্রাস করে নিলে।

জার্মান গল্পটি ইয়াকব আর উইলহেলম গ্রিম সংগৃহীত। নাম ফ্রাউ হোল্লে (Frau Holle) অর্থাৎ পুরস্ত্রীপস্ত্যা। গল্পটি এই :

এক বিধবার দুটি মেয়ে, একটি সুন্দরী ও সুশীলা, আর একটি কুৎসিত চেহারা ও দুঃশীলা। মা কিন্তু এই ছোট দুঃশীলা মেয়েটিকেই ভালোবাসত। বড়ো মেয়েকে মা সংসারের কাজে খুব খাটাত। একদিন সে মেয়ে রাস্তার ধারে বেঞ্চিতে বসে সুতো কাটছিল। কাটতে কাটতে তার হাত কেটে রক্ত ঝড়ে পড়ে সূতো নষ্ট করে দিলে। তখন সে কুয়ায় গেল টাক্‌টা ধুয়ে নিতে। ধুতে গিয়ে তা কুয়োর তলায় পড়ে গেল। মাকে বলতে মা রেগে বললে, যা কুয়ায় নেমে তুলে নিয়ে আয়। মায়ের কথায় কুয়ায় নেমে সে দেখলে এক বেশ খটখটে উজ্জ্বল সুন্দর স্থান। একটু গিয়ে দেখলে সে বনের ধার ঘেঁসে একটি কুটির রয়েছে। সে কুটিরে ঢুকল। ঢুকতেই উনুনে যে রুটি সেঁকা হচ্ছিল সে রুটি যেন বললে, আমাকে উনুন থেকে নামিয়ে রাখ, নইলে পুড়ে ছাই হয়ে যাব। মেয়েটি তাই করলে। তারপর এগিয়ে যেতে যেতে দেখলে একটা আপেল গাছে এত ফল পেকে রয়েছে যে, গাছটা যেন কাতরাচ্ছে, যেন বলছে, আমাকে নাড়া দিয়ে

আমার বোঝা কমিয়ে দাও। মেয়েটি তাই করলে। অনেকগুলি আপেল ঝরে পড়ায় গাছটি খাড়া হয়ে উঠল। তারপর যেতে যেতে সে এল এক ছোট্ট কুটিরের কাছে। দেখলে কুটিরের দরজার কাছে এক বুড়ি বসে আছে। তাকে দেখে বুড়ি আদর করে কাছে ডেকে তার কথা জিজ্ঞাসা করায় সে সব কথা বললে, তার মাকুটি ফেরত চাই। বুড়ি বললে, তুমি আমার কাছে থেকে দু-চারদিন কাজকর্ম কর, তবে মাকু পাবে।, কাজকর্ম হল এই যে, তাকে বিছানা পাততে হবে, আর সকালবেলায় বিছানাপত্র দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে ঝাড়তে হবে, যাতে করে গদি-তোশকের পালক (অর্থাৎ তুলো) কিছু কিছু বেরিয়ে পড়ে উড়ে যাবে আর নীচের লোকেরা বুঝবে যেন তুষার ঝরছে। মেয়েটি বুড়ির কাজ করতে লাগল। কিছুদিন পরে বাড়ি ফেরার জন্য তার মন কেমন করতে লাগল। বুড়িকে বলাতে বুড়ি রাজি হল। তার মাকু ফেরত দিলে আর তাকে ঝলমলে পোশাক পরিয়ে দিলে। চৌকাট পেরবার সময় তার গায়ে সোনার মোহর ঝড়ে পড়ল। সে তা কুড়িয়ে নিল। তারপর সে বাড়ি চলে এল। তাকে আসতে দেখে তাদের পোষা মোরগ ককরকো করে ডাক ছাড়তে লাগল আনন্দে।

বড়ো মেয়ের ঐশ্বর্য দেখে মায়ের মনে হল প্রিয় ছোট মেয়েরও যেন এই রকম হয়। সে তার দিদির সুতো কাটার অনুকরণ করলে, কুয়ায় নামল। তারপর তার দিদির মতোই সব ঘটল। তবে সে উনুন থেকে রুটি নামালো না, আপেলগাছ ঝেড়েও দিলে না। বুড়ির ঘরে সে রইল বটে তবে অত্যন্ত অসুখীমনে। বাড়ি যাবার সময়ে সে কিছুই পেলে না। চৌকাট ডিঙোবার সময় তার গায়ে আলকাতরা বৃষ্টি হল। তাকে আসতে দেখে মোরগ আনন্দধ্বনি করলে না।

বাংলা ও জার্মান গল্পের এই সারমর্ম শুনে পাঠকেরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, গল্পগুলি একই গল্পবীজ থেকে উৎপন্ন। বাংলা গল্পের পাঠের মধ্যে লালবিহারীর পাঠই সবচেয়ে পুরোনো এবং খাঁটি। তার মধ্যে জার্মান গল্পের প্রভাব নেই, এবং পড়াও সম্ভব নয়। তাই প্রথমে লালবিহারীর গল্পের সঙ্গো জার্মান গল্পের তুলনা করি।

বাংলা গল্পে বিরোধ আছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, জার্মান গল্পে আছে মায়ের মনে। সেই হেতু বাংলা গল্প মিলনান্ত, আর র্জামান গল্প মিলনান্ত এবং বিয়োগান্ত—দুই-ই— এবং সেই হেতু জার্মান গল্প দুটি মর‍্যাল—১. গার্হস্থ্য কর্তব্য করলে দৈব অনুগ্রহ পাওয়া যায় এবং ২. ভালো মানুষের ভালো হয়, মন্দ মানুষের ভালো হয় না। প্রথমটিই গল্পের আসল মর‍্যাল।

বিরোধ স্বাভাবিক দেখাবার জন্যে উকুন বাছার অছিলা দেখানো হয়েছে ঘর থেকে তাড়াবার। এ-মোটিফ বাংলাদেশে নিজস্ব। দু বিবাহ ইউরোপে নেই। তাই সেখানকার গল্পে বিরোধ দেখাবার চেষ্টা হয়েছে দু বোনের মধ্যে। গল্পে উল্লেখ না থাকলেও, আসলে এখানে বড়ো মেয়ে সতিন কন্যা ছিল বলে মনে হয়।

গল্প দুটির মধ্যে আশ্চর্য মিল রয়েছে। নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে নায়িকার স্বতঃপ্রবৃত্ত

হয়ে ঘরোয়া কাজ সম্পন্ন করে যাওয়া। বাংলায়—গোরুকে জাব দেওয়া, গাছের তলা পরিষ্কার করা, জার্মানে—রান্নাকাজ চুকিয়ে দেওয়া, ফুলন্ত গাছের পরিচর্যা করা।

আরও আশ্চর্য মিল দেখি দেবতার ব্যাপারে। দুটি গল্পেই দেবতার অধিষ্ঠান খালি কুটিরে। বাংলা গল্পে দেবতার প্রতিনিধি তাঁর উপাসক মুনি। জার্মান গল্পে দেবতা বুড়ি। তবে তিনিও মুনির মতো কুটিরের বাইরে ছিলেন। দুটি গল্পেই শূন্য কুটিরটিই হচ্ছে দেবতার পীঠস্থান এবং প্রতীক। এ দেবতা স্পষ্টই ঋগ্‌বেদের অদিতিপস্ত্যা[১] ও অরণ্যানী একাধারে। অরণ্যানী সূক্তের একটি ঋকে যেন এমনি কোনো গল্পের বীজ আছে বলে মনে হয়।

উত গাব ইবাদন্তী উত বেশ্মেব দৃশ্যতে। ১০/১৪৬/৩ক। 'আর যেন গোরুর মতো খাচ্ছে। আর যেন কুটিরের মতো দেখাচ্ছে।'

বাংলা গল্পে উপহার ঝাঁপি বা পেটিকা পাওয়া স্বাভাবিক নিয়ম। জার্মান গল্পে তেমনি বিদায়ের বেলা মোহর বৃষ্টিও তেমনি স্বাভাবিক নিয়ম। প্রাচীনতর কালে ছিল ধান-চাল অথবা শস্যদানা বর্ষণ। আমাদের ছিল ধান অথবা খই ছড়ানো। এদিক দিয়ে র্জামান গল্পটি অধিকতর অবিকৃত। জার্মান গল্পের বুড়ি হল পুরন্ধ্রী দেবী অদিতি।

দক্ষিণারঞ্জনের গল্পের সঙ্গে জার্মান গল্পের মিল আরও বেশি। এখানেও দুই বোন, তবে এক মায়ের নয়, সতাত। এখানেও তুলোর কারবার, তবে কাটার নয়, পেঁজার। এখানেও ঘরের সামনে বুড়ি। মন্দ কুৎসিত বোন দু গল্পেই কুৎসিততর হয়ে গেল। সন্দেহ হচ্ছে যে, দক্ষিণারঞ্জনের গল্পে জার্মান গল্পের কিছু প্রভাব পড়ে থাকবে।

বাংলা ও জার্মান গল্প দুটির জড় বহু প্রাচীন। এমনকী ঋগ্‌বেদের চেয়েও পুরোনো হওয়া সম্ভব। ইন্দো-ইউরোপীয়ভাষী গোষ্ঠীরা পৃথক হবার আগেই এ-গল্পের বীজ উপ্ত হয়েছিল।[২]

তিন

গোড়া থেকেই সাহিত্যের দুটি প্রধান ও প্রশস্ত স্রোত বা ধারা, কবিতা ও গল্প। কবিতার ধারা নদীর মতো, মাটির বুকে চলে, তার বাঁধন আঁটোসাঁটো, তার গতি নির্দিষ্ট পথে। খাত ছেড়ে সে স্রোতের যেদিকে-সেদিকে ধাওয়া করে চলে না। সে চলে মাটির টানে অর্থাৎ ছন্দের বাঁধনে। গল্পের ধারা বা স্রোত মাটির টানে আবদ্ধ নয়।

তার বস্তু অর্থাৎ ভাব কোনোদিকে গতিরুদ্ধ নয়। হাওয়ার টানের মতো তা যেদিকে খুশি যতদূর ইচ্ছে যেতে পারে। ভাষা যেমন-তেমন হলে কবিতা জমে না, কিন্তু ভাষা যেমন-তেমন হলেও গল্পরস জমতে বিশেষ বাধা হয় না। প্রাচীনকালে যখন বয়স্ক মানুষের মন সংস্কারের দুরমুশে (sophistication-এ) জমাট বাঁধেনি, তখন এক

১ ঋচা গিরা মরুতো দেব্যদিতে সদনে পস্ত্যে মহি।।৮-২৭-৫গঘ।।

২. 'গল্পের গাঁটছড়া' প্রবন্ধটি পঠনীয়।

দেশের গল্প অন্য দেশে উড়ে গিয়ে সেখানে শিকড় গাড়তে কোনো বাধা হত না। এখন হয়। এখন সমাজে অনেক পাঁচিল উঠেছে। তার উপর মানুষের মন এখন সাধারণত সরল ও স্বচ্ছ নয়। সে নানারকম ভাবনায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের, অর্থ-অনর্থের বিচিত্র দলবাজির নেশায় বুঁদ। তাই তার সাহিত্য এখন খোলামেলা বিষয়ের গল্প লেখে না। তাই এসব গল্পের পাঠকও খুব কম, এমনকী নিজের ভাষাতেও। আমি আগেকার কথাই বলছি। একটি বাংলা গল্পের সঙ্গে একটি আর্মানি গল্পের অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য।

বোধ করি সকলেই যাঁরা লোক-অভিজ্ঞার (folklore) চর্চা করেন, জানেন যে, লোকপ্রচলিত গল্প-কাহিনী কখনো অনেক দূর দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে তাঁরা এটাও জানেন যে, ঘটনার motif অথবা গঠনের (structure) মিল স্বাধীন ও আকস্মিক হতে পারে, কেননা, মানব-মানসের একটা মোটামুটি মিল সর্বত্র আছে। পাহাড় পর্বত নদী সমুদ্র—এসব ব্যবধান থাকলেও কোনো কোনো বিষয়ে—সব মানুষ না হলেও অনেক মানুষ এক রকম ভাবনা করে এক রূপ চিন্তা করে। সুতরাং ঘটনায় অথবা গঠনে ঐক্য দেখলেই কোনো দুটি গল্পের মধ্যে জন্মগত যোগসূত্র কল্পনা করা সঙ্গত নয়। তবে যদি ঘটনায় ও গঠনে ঐক্য থাকে, তাহলে গল্প দুটির পৃথক উৎপত্তি কল্পনা করা সঙ্গত হবে না। বুঝতে হবে হয় একটি থেকে আর একটির উৎপত্তি হয়েছে, নয় তৃতীয় একটি গল্প থেকে গল্প দুটি উৎপন্ন হয়েছে। মূল গল্প খুঁজে পাওয়া প্রায়ই খুব কঠিন কাজ, কেননা সব দেশেই প্রাচীন গল্প মুখ থেকে ছাপার অক্ষরে প্রতিবদ্ধ হয়েছে।

এখন আমি এমনি দুটি দূরবিচ্ছিন্ন গল্প আলোচনা করে সে-গল্প দুটি যে একমূল তা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করছি। একটি গল্প[১] বাংলাদেশে চলিত, অপর গল্পটি[২] আর্মানি দেশে। গল্প দুটি আগে সংক্ষেপে বলে নিই। বাংলা গল্পটি অনেকের জানা থাকতে পারে, তবে আর্মানি গল্পটি অনেকেরই অজানা থাকতে পারে।

প্রথমে বাংলা গল্পটি বলি।

এক রাখাল ছেলে আর তার মা থাকত। রাখাল রাজার বাড়ি গোরু চরাত। সকালে এসে সে গোরু নিয়ে যেত আর সন্ধ্যার আগে সে গোরু গোয়ালে ঢুকিয়ে দিয়ে বাড়ি গিয়ে ভাত খেত। একদিন কোন এক পর্ব উপলক্ষে রাজা তাঁর সব লোকজনকে পিঠে খাওয়ালেন। রাখাল হাজির ছিল না বলে বাদ গেল। পরের দিন সে রাজার কাছে অনুযোগ করলে যে, সে গত দিন পিঠে খেতে পায়নি। শুনে রাজা দুঃখিত হলেন। তাঁর ভাঁড়ারিদের হুকুম দিলেন, রাখালদের বাড়িতে উপযুক্ত পরিমাণ চাল ডাল তেল ও গুড় পাঠিয়ে দিতে, যাতে তারা প্রচুর পিঠে গড়ে খেতে পারে। ভাঁড়ারি তাই করলে। সে-সব জিনিস পেয়ে রাখালের মা খুব খুশি হয়ে রাত্রিতে পিঠে গড়লে। সকালবেলা

১ 'পিঠে গাছ' (আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'রাক্ষস- খোক্কস', ১৯০২ থেকে)। গল্পটির এক পাঠ আছে বোম্‌পাসের Folklore of the Santal Parganas গ্রন্থে।

২ '-antek' (পী, ডাউনিং কৃত অনুবাদ—অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত)।

রাখাল কোঁচড়ে পিঠে বেঁধে নিয়ে যথারীতি গোরু চরাতে গেল। মাঠে পৌঁছে গোরু ছেড়ে দিয়ে এক জায়গায় বসে রাখাল মনের আনন্দে পিঠে খেতে লাগল। খেতে খেতে একটা পিঠে ফস্‌কে মাটিতে পড়ে গেল। সেখানে একটা গর্ত ছিল, সেই গর্তের মধ্যে পড়ে পিঠেটা তলিয়ে গেল। রাখাল সেটাকে উদ্ধার করতে অনেক চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না। তখন সে খুব রেগে গিয়ে গর্তের ধারে তার গোরু-তাড়ানো লাঠি ঠুকে শাসনের সুরে বললে যে, কাল এসে যদি সে পিঠে না পায়, তবে সে গর্ত খুঁড়ে যেমন করে হোক বার করবে। সন্ধ্যে হব-হব হতে সে গোরু নিয়ে চলে গেল।

পরের দিন সেখানে এসে দেখে যে, সেই গর্তর কাছে একটা বড়ো গাছ রাতারাতি গজিয়ে উঠেছে আর তার ডালে ডালে ফলের মতো পিঠে অজস্র ঝুলছে। গোরু চরতে দিয়ে রাখাল গাছে উঠল আর মনের আনন্দে গরম গরম পিঠে খেতে লাগল সেই সঙ্গো ছড়াও কাটতে লাগল:

কেমন মজার কল
পিঠে গাছের ফল
কেমন মজা ভাই
পেটটা ভরে খাই।

তখন সেখান দিয়ে এক ডাইনি রাক্ষসী যাচ্ছিল। সে রাখালের গাছতলায় এসে তার কাছে কাতরভাবে পিঠে চাইতে লাগল। রাখাল গাছ থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিতে চাইলে কিন্তু ডাইনি তাতে রাজি হল না। বললে, তুমি নেমে এসে নিজে হাতে করে দাও। ডাইনির কথায় ভুলে রাখাল গাছ থেকে নেমে এল বুড়িকে পিঠে দিতে, আর বুড়ি অমনি তাকে ধরে জব্দ করে তার ঝুলিতে পুরে নিলে। তারপর ঝুলির মুখ এঁটে সে কাঁখে করে নিয়ে চলল তার বাড়ির দিকে। যেতে যেতে তার খুব তেষ্টা পেল। সে একটা পকুর দেখে তার পাড়ে ঝুলি নামিয়ে জল খেতে গেল। ব্যাপার বুঝে রাখাল ঝুলির মধ্যে থেকে চেঁচাতে লাগল। কাছেই কয়েকজন ছেলে গোরু চরাচ্ছিল। তারা এসে ঝুলির মুখ খুলে দিয়ে রাখালকে মুক্ত করলে। রাখাল পালিয়ে গেল। ছেলেরা ঝুলির মধ্যে ইঁটপাটকেল ভরে দিয়ে ঝুলির মুখ বেঁধে দিলে। ডাইনি কিছুই জানে না। সে এসে ঝুলি কাঁখে করে বাড়ি গেল। বাড়িতে গিয়ে ঝুলির মুখ খুলে দেখলে যে রাখাল পালিয়েছে।

পরের দিন আবার বুড়ি এল। সেদিনও রাখাল পিঠে গাছে চড়ে পিঠে খাচ্ছে। সেদিনও রাখাল বুড়ির কথায় ভুলে তাকে পিঠে দিতে গাছ থেকে নামল। বুড়িও তাকে ধরে ঝুলিতে পুরলে। এবার বুড়ি পথে কোথাও না থেমে সটান বাড়ি এল। ঝুলি খুলতে রাখাল বেরিয়ে এল। বুড়ি তার বউকে বললে, রাখালকে কেটেকুটে ঝোল ও অম্বল রাঁধতে। এই বলে বুড়ি পাড়ার ডাইনি-রাক্ষসীদের নেমন্তন্ন করতে বেরোল। ডাইনির বউটাকে ভালো মানুষ দেখে রাখাল তাকে ভুলিয়ে কাপড়চোপড় গয়নাগাঁটি

সব পরলে। তারপর সে ডাইনীর বউ সেজে রয়েছে। তার বউকে কেটেকুটে রান্না চড়িয়ে দিলে। রান্না শেষ হতে না হতে ডাইনি রাক্ষসী ফিরে এল। কিন্তু সে বুঝতে পারলে না যে রাখাল তার বউ সেজে রয়েছে। তারা সব খেতে বসল। তারপর রাখাল স্নান করবার অছিলায় পালাল। নদী পেরোবার সময় সে চেঁচিয়ে বলে দিলে যে, সে নিজের বউয়ের মাংস খেয়েছে। অমনি ডাইনি দৌড়ালো তাকে ধরতে। কিন্তু ইতিমধ্যে রাখাল নদী পার।[১] সে কিছুই করতে পারলে না।

আর্মানি গল্পটি এবার সংক্ষেপে বলি।

এক স্ত্রীলোকের ছিল একগাদা মেয়ে। তাদের নিয়ে সে সর্বদাই ঝঞ্ঝাট মানত। একদিন সে বিরক্ত হয়ে মেয়েগুলোকে উনুনের মধ্যে পুরে দিয়েছিল। তারা সব পুড়ে মরে যায়। তবে সবচেয়ে ছোট মেয়েটা সেদিন উনুনের পিছনে লুকিয়ে ছিল বলে পার পেয়ে যায়। দুপুরবেলা হলে মায়ের খেয়াল হল মাঠে কর্তার খাবার পাঠাতে হবে। সে-কথা সে মনের দুঃখে চেঁচিয়ে বলাতে ছোট মেয়ে উনুনের পিছনে থেকে বেরিয়ে এসে বললে, আমি যাব। সে তার বাবার খাবার নিয়ে মাঠে গেল। বাবা খাবার খেয়ে মেয়েকে বললেন, দূরে না গিয়ে কাছাকাছি থাকতে আর নিকটে যে আপেলগাছ ছিল তার থেকে ফল পেড়ে না খেতে। আপেলগাছে পাকা আপেল ঝুলছে দেখে মেয়েটি বাপের কথা ভুলে গিয়ে আপেল পেড়ে নিয়ে খেতে লাগল। এমন সময় এক কানা বুড়ি—আসলে প্রেতিনী ডাইনি (werewolf or goblin) এসে মেয়েটির কাছে আপেল চাইলে। মেয়েটির মনে দয়া হল। সে যেই আপেল দিতে যাবে অমনি ডাইনি তাকে ধরে থলেতে পুরে নিলে। তারপর সে চলল নিজের বাড়ির দিকে। যেতে যেতে মেয়েটি এক জলাশয়ের কাছে এসে থলের ভিতর থেকে বললে, আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে, জল খাব। বুড়ির থামবার প্রয়োজন হয়েছিল। সে সেই জলাশয়ের ধারে থামল। মেয়েটিকে জল খেতে ছেড়ে দিলে। মেয়েটি থলে থেকে বেরিয়ে পালাল। তার আগে সে থলে ইঁটপাটকেলে ভরে দিয়েছিল। বাড়িতে এসে ডাইনি দেখলে যে মেয়েটা তাকে ঠকিয়েছে।

তারপর আবার একদিন এমনি ঘটনা ঘটল। সেবারেও এমনি করে মেয়েটি পালাতে পেরেছিল। তিনবারের বেলায় মেয়েটি আর পালাতে পারলে না। থলি থেকে মেয়েটিকে বার করে দিয়ে ডাইনি তার বউকে বললে ওকে কেটেকুটে রান্না করতে। বাংলা গল্পের মতোই এখানে মেয়েটি ডাইনির বউকে কেটেকুটে রান্না করলে, বুড়িকে খেতে দিলে। ডাইনি যখন খাচ্ছে তখন মেয়েটি ঘরের মাচায় উঠে চেঁচিয়ে বললে, 'তোর বউয়ের মাংস খাচ্ছিস।' ডাইনি রেগে দিগ্‌বিদিকশূন্য হয়ে গেল। কানা সে, মেয়েটাকে ধরতে পারছে না। সে বললে, 'কোথায় তুই?'' মেয়েটি বললে, 'আমি মাচায়'। ডাইনি মাচায় উঠতে গিয়ে খোঁচাখুঁচি খেয়ে পড়ে মরে গেল। মেয়েটি পালিয়ে গেল।

১ গল্পে আছে পুকুর। পুকুর নয়, নদী হবে। ডাইনি রাক্ষসেরা নদীস্রোত পেরোতে পারে না।

গল্প দুটি যেন হুবহু এক। তবুও একটিকে অপরটি থেকে উৎপন্ন বলা যায় না যদি কাহিনীর শেষ অংশ উপেক্ষা করি। এই অংশে শিকারের যে গতির নির্দেশ করা হয়েছে তা যেন বাঙালি গৃহস্থ ঘরেরই প্রতিবিম্ব পড়েছে। জেলে মাছ দিয়ে গেলে বউড়ি-ঝিউড়ি যেমন কেটে রান্না করে ঠিক তেমনি বর্ণনা। অন্যত্র কিন্তু মিল নেই।

আর্মানি গল্পের আপেল গাছ স্বাভাবিক, বাংলা গল্পের পিঠে গাছ স্বাভাবিক মনে না হলেও অস্বাভাবিক নয়। রূপকথায় এমনটি হয়ত স্বাভাবিক। বাংলা গল্পটি সাঁওতাল পরগনায়ও মিলেছে। সুতরাং বাংলা গল্পটিকে নবসৃষ্টি বলা যায় না। আর্মানি গল্পের উপক্রমণিকার মতো কিছু বাংলা গল্পে নেই। তবুও এ অংশকে বাতিল কবা যায় না। নিষ্ঠুর মায়ের প্রতিনিধিই যেন কানি ডাইনি। ডাইনিকে কানি হতে হয়েছে। মেয়েটির দু-দুবার পালাবার সুযোগ দেবার জন্যেই। এ অংশটুকু বাংলা গল্পে বেশি স্বাভাবিক বলে মনে হয়।

খাদ্যবস্তু থেকে গাছ জন্মানো—যে গাছ সে খাদ্যের উৎস—এমন মোটিফ বাংলা আর কোনো রূপকথায় পাই না, পাই আর্মানি-হাঙ্গেরি কোনো কোনো রূপকথায়। তবে দৈবের অথবা দৈত্য-দানব-ভূতের কৃপায় তৈরি খাদ্যবস্তু অজস্র পাওয়ার মোটিফ একাধিক বাংলা গল্পে আছে।

মনে হয় আর্মানি গল্পটি যেন ডগভাঙা। কেন যে মা মেয়েদের উপর তিতিবিরক্ত, কেন যে সে মেয়েদের পুড়িয়ে মারলে তার কোনো হেতুর নির্দেশ নেই। মা ও কি তবে ডাইনি? বাংলা গল্পে এমন কোনো অসঙ্গাতি নেই।

বাংলা আর কোনো গল্পে পিঠে গাছের মোটিফ নেই বটে তবে অনুরূপ মোটিফের অন্তত একটি খাঁটি দেশী গল্প আছে। সে হল কড়ি গাছ ও বাঘের গল্প। এ গল্পটি ছাপা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। তবে গল্পটি আমি শৈশবে বাবার মুখে অনেকবার শুনেছি। অনেককাল পরে আমার এক তদানীন্তন ছাত্র ডক্টর শ্রীভবতারণ দত্তের কাছে শুনেছিলুম, গল্পটি চন্দননগর অঞ্চলে অজানা নয়। গল্পটি বাংলা ছেলে ভুলোনো গল্পের আদর্শ অনুযায়ী, তবে উপসংহারে বেশ একটু নিষ্ঠুরতা আছে।

কোনো গ্রাম থেকে একটু দূরে এক বাঘের গুহা ছিল। সে গুহার কাছে এক গাছ ছিল তাতে কড়ি ফলত। এ গাছের যে মালিক ছিল সে বাঘ। একদিন গাঁয়ের দু-চারজন মেয়ে দূরে বেড়াতে এসে সেই কড়ি গাছ দেখতে পায় আর গাছ থেকে কিছু কড়ি পেড়ে নিয়ে যায়। তখন বাঘ গুহায় ছিল না, চরতে গিয়েছিল। তারপর থেকে মেয়েরা প্রায় সেই সময়ে এসে গাছ থেকে কড়ি পেড়ে নিয়ে যেত। একদিন বাঘের নজর পড়ল গাছের দিকে। তার মনে হল কে বা কারা যেন গাছ থেকে কড়ি পেড়ে নিয়ে গেছে। তারপর থেকে সে চরতে না গিয়ে গাছের কাছে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকত। তারপর যেদিন মেয়েরা কড়ি পাড়তে এসেছে সেদিন তাদের দেখে সে হালুম করে তাড়া করলে। একজন মেয়ে গাছে উঠে ডাল নাড়া দিচ্ছিল, অমনি ঝরঝর করে

কড়ি পড়ছিল আর অন্য মেয়েরা তলা থেকে কুড়োচ্ছিল। যারা তলায় থেকে কুড়োচ্ছিল তারা বাঘের ডাক শুনে যে যেদিকে পারে ছুটে পালাল। ধরা পড়ল যে মেয়েটি গাছে ছিল। সে ধরা পড়ে কাঁদতে লাগল। বাঘ বললে, কেঁদে কি হবে। আমার তিন চারটে ছানা আছে। তাদের মা নেই। তোমাকে তাদের দেখাশুনা করতে হবে, সংসারের সব কাজকর্ম রাঁধাবাড়াও করতে হবে। কী করে, মেয়েটিকে বাধ্য হয়ে বাঘের ঘরে গিন্নি হতে হল। কিছুকাল গেলে পর বাঘ মেয়েটির বশ হয়ে গেল। তখন সে বাঘকে দিয়ে তার বাপের বাড়ি খাবার-দাবার জিনিসপত্র পাঠাতে লাগল। বাঘ বাজারে হামলা দিয়ে সে সব লুট করে আর রাত্রিতে মেয়েটির বাড়িতে ফেলে দিয়ে আসে।

এমনি করে দিন যায়। একদিন বাঘের পিঠে খেতে সাধ হল। মেয়েটি তা শুনে তাকে দিয়ে চাল ডাল ঘি তেল ময়দা নুন মশলা সব আনিয়ে নিলে। পরের দিন বাঘ চরতে বেরোলে সে উনুনে তেলের কড়া চড়িয়ে বাঘের ছানাগুলির মুন্ডু কেটে ফুটন্ত তেলের কড়ার উপর চাপিয়ে দিলে। গরম তেলে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ে আর ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে শব্দ হয়। ঠিক পিঠে ভাজার শব্দ। এই করে মেয়েটি তার সব গয়নাগাঁটি নিয়ে পালিয়ে গেল বাড়ির দিকে। বাঘ তাড়াতাড়ি করে আসছে পিঠে খাবার লোভে। গুহার কাছে এসে ছ্যাঁক ছোঁক শব্দ শুনে তার খিদে বেড়ে গেল। তারপর গুহায় ঢুকেই তাজ্জব।

লাখের (নাগাদের) মধ্যে প্রচলিত একটি গল্পে কড়ি গাছের মালিক বাঘের কথা আছে। তবে সে কাহিনী অন্যরূপ।

চার

ভারতীয় সাহিত্য, তা সে ধর্ম সাহিত্য চাই সাধারণ সাহিত্য হোক, গল্পে ভরপুর। ঋগ্‌বেদের কথা ছেড়ে দিই। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের শাঁস বললে গল্পই। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে অনেক টুকিটাকি ভালো গল্প আছে। এমনকি চমৎকার ছোট গল্প আছে। এই উদাহরণ দিই যথাযথ অনুবাদ করে তৈত্তিরীয় আরণ্যক থেকে।

অগ্নির তিন বড়ো ভাই ছিল। তারা দেবতাদের নৈবেদ্য বইতে বইতে মিইয়ে গেল। তখন অগ্নি ভয় পেলে—এই মতো তো ওরও দুরবস্থা ঘটবে ভেবে।

সে ভাগল। সে জলের মধ্যে ঢুকে গেল। দেবতারা চর লাগিয়ে তাকে খুঁজতে লাগল।

তাকে ধরিয়ে দিলে এক মাছ। তাকে (অগ্নি) শাপ দিলে, আমাকে যে ধরিয়ে দিলি তোকে তক্কে তক্কে মারবে।

সেই থেকে মাছ মারে তক্কে তক্কে শাপ পেয়েছে বলে।

এই ছোট গল্পটিকে আমাদের সাহিত্যে প্রথম গোয়েন্দা গল্প বলে ধরতে পারি।

গোড়া থেকেই গল্প বাহন হয়ে ব্যবহৃত হত শিক্ষায়, উপদেশে যেমন কবিতা ব্যবহৃত হত দেবারাধনায়। বৈদিক আমল শেষ হবার সঙ্গো সঙ্গো গল্প তার বাহন

গদ্য পরিত্যাগ করে পদ্যের সাগরে ঝাঁপি দিয়ে যেন আত্মহত্যা করেছিল। অতঃপর গল্প আর গল্প রইল না, দেবতাদের কাণ্ডকারখানায় কাহিনী রূপে অনুষ্টুপ শ্লোকে প্রবাহিত হতে থাকে শেষ পর্যন্ত। খ্রীস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দীর মাঝের দিকে গদ্যে গল্প লেখার ফ্যাশান কিছু কালের জন্যে দেখা দিয়েছিল। এ সব কাহিনীও শিক্ষাপ্রদ অথবা নীতিগর্ভ। তবে এগুলি নূতন সৃষ্টি নয়, পুরোনো গল্পেরই নব সংস্করণ।

সংস্কৃতের উচ্চ সাহিত্য থেকে গদ্য গল্প নিষ্ক্রান্ত হল বটে কিন্তু প্রাকৃতের ভদ্র সাহিত্যে গল্প নির্বাসিত হয়নি। তবে এখানেও দেখি যে পদ্যের আক্রমণ ঘটেছে সংস্কৃতের প্রভাবে কোনো কোনো সম্প্রদায়ে। স্থবিরবাদীয় রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সাহিত্যের ভাষা পালি সংস্কৃতের মতোই পরিশীলিত ভাষায় পরিণত হয়েছিল। এ ভাষায় জাতক গল্পগুলি প্রথমে পদ্যেই সংকলিত হয়েছিল সংক্ষিপ্তভাবে। অনেককাল পরে সেগুলি গদ্যে বিস্তারিত হয়েছিল। (সেকালের ভালো ভালো গল্পগুলির নায়ককে বুদ্ধের পূর্বজন্মের জাতক কল্পনা করে বৌদ্ধ সাহিত্যে সেগুলি সংকলিত হয়েছিল জাতক কাহিনী বলে।) উদারপন্থী মহাযানিকেরা এই সব গল্প গদ্যেই বিস্তারিতভাবে লিখেছিলেন। তবে সে গদ্য পালি ভাষায় নয়, সে কালের অল্পশিক্ষিত জনগণের বোধ্য ভাষা মিশ্র সংস্কৃত প্রাকৃতে। (এই ভাষাকে পণ্ডিতেরা এখন বৌদ্ধ সংস্কৃত অথবা বৌদ্ধ সংকর সংস্কৃত নাম দিয়েছেন)। এই উদারপন্থী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও পুরোনো গল্পগুলিকে বুদ্ধের—ঠিকভাবে বলতে গেলে বোধিসত্ত্বের, কেননা তখন তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হননি—পূর্বজন্মের ইতিহাস বলে নিলেও এগুলি জাতক নাম দেননি, 'অবদান' (অর্থাৎ উজ্জ্বল কীর্তি) বলেছেন।

খ্রীস্টীয় তৃতীয় চতুর্থ (?) শতাব্দীর দিকে পৈশাচী প্রাকৃতে অর্থাৎ পালির মতো ভাষায় প্রচলিত বিখ্যাত গল্পগুলির এক সংকলন করেছিলেন গুণাঢ্য। বইটির নাম 'বড্ডকহা'। বইটির নাম ও লেখকের নাম জানা আছে, কিন্তু বইটি পাওয়া যায়নি। কিন্তু তা বলে গল্পগুলি নষ্ট হয়নি। গুণাঢ্যের গ্রন্থের গল্পগুলি একাধিক লেখক কর্তৃক সংস্কৃতে অনূদিত হয়ে রক্ষা পেয়েছিল (একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী)। এই অনুবাদ করেছিলেন দুজন। এঁদের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র। এঁর গ্রন্থের নাম 'বৃহৎকথামঞ্জরী'। আর একজন ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী সোমদেব। এঁর গ্রন্থের নাম 'কথাসরিৎসাগর'। এঁরা দুজনেই কাশ্মীরের লোক ছিলেন। সুবিখ্যাত বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্প গুণাঢ্যের গ্রন্থের অনুবাদ থেকেই মিলছে।

ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ ও জৈন—সেকালের এই তিন প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ের জনগণের মধ্যে সবচেয়ে গল্পপ্রিয় ছিলেন জৈনেরা। তাছাড়া এদের রুচিও ব্যাপক ছিল। প্রাচীন বিদেশাগত নবীন রচিত এবং ব্যক্তিগত ঘটনা গ্রথিত নানা রকম গল্প এঁরা সংকলন করে গেছেন সপ্তম শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত। সংগ্রহকর্তারা সবাই ছিলেন জৈন মহান্ত। এই সব গল্পের মধ্যে আধুনিক ভাষার গোড়ার দিকে লেখা কিছু কিছু গল্পের বীজ পাওয়া যায়।

২. *সাহিত্যে শৈশব*

সাহিত্য ও শৈশব প্রবন্ধে যে সব কথা বলেছি তার নিষ্কর্ষ দিয়ে এই দ্বিতীয় প্রবন্ধ শুরু করছি।

মানুষের শৈশব যৌবন বার্ধক্য আছে। সাহিত্যের তা নেই। সাহিত্যে প্রকাশিত হয় মানুষের দৃষ্টি ও চিন্তা। এ দৃষ্টি ও চিন্তা সাবালক মানুষের তা তার বয়স যেমনই হোক না কেন। বিষয়ের বিচারে সাহিত্যকে শৈশব যৌবন ও বার্ধক্যের ভাগ করার কোন মানে নেই। যাকে আমরা শিশু সাহিত্য বলে মনে মনে অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা করি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে গুণ ও মূল্য থাকতে পারে। মানুষের দৃষ্টি যদি স্বচ্ছ হয় তার চিন্তা যদি অনাবিল হয় তবে সে মানুষ যে কালেরই হোক না কেন তার রচনায় যদি তার দৃষ্টি ও চিন্তা প্রতিফলিত হয় তবে তা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পর্যায়ে পড়বে, কেন না তা সর্বকালীন সর্বজনীন। এই বিবেচনা করেই টলস্টয় প্রাচীন গল্পগুলিকে সাহিত্য শিল্পের প্রথম শ্রেণীতে ফেলেছিলেন। মানুষ কালের স্রোতে যত এগিয়ে যাচ্ছে ততই তারা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এর ফলে ব্যক্তি মানুষের ভিড় বাড়ছে এবং তাঁদের দৃষ্টি ও চিন্তা নব নব সাহিত্য সৃষ্টি করছে সন্দেহ নেই। এই বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্য বেড়েই চলেছে কিন্তু তার মধ্যে সর্বজনিকতার ও সর্বকালিকতার রং ও রস খুবই ফিকে হয়ে আসছে। যত বেশি মানুষকে ভোলাতে ভাবাতে পারে যে রচনা সেই তো তত বেশি উৎকৃষ্ট। যত বেশি বলতে ঠিক সংখ্যার উপর নির্ভর করছি না। নির্ভর করছি বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন মতের বিভিন্ন দৃষ্টির—এমনকী বিভিন্ন কালের মানুষের স্বীকৃতির উপর।

সব সাহিত্যেরই একদা শৈশব ছিল, কিন্তু তা মানব শিশুরই বাল্যাবস্থার মতো। শৈশবের চপলতা চাপা পড়ে যায় যৌবনের প্রগল্‌ভতায়।

সুতরাং সাহিত্যের শৈশব নেই।

প্রথমেই বলে রাখি আমার আলোচনা আমাদের দেশের সাহিত্য নিয়ে, আমাদের নিজের সাহিত্য নিয়ে। তার মানে বাংলা সাহিত্য নিয়ে এবং বাংলা ভাষা যার থেকে এসেছে সেই সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার সাহিত্য নিয়ে। সংস্কৃত ভাষায় শিশুকে নিয়ে কিছু সাহিত্য রচনা হয়েছিল। প্রাকৃত ভাষায় আমরা প্রথম পাচ্ছি শিশুর জন্য রচনা। তবে তা যৎকিঞ্চিৎ। সুতরাং এইখানে বলে দিই।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে সাহিত্যের দুটি মহল ছিল—সদর ও অন্দর। সদর মহলের সাহিত্য আমরা সকলেই জানি সংস্কৃত সাহিত্য। অন্দর মহলের সাহিত্যে আমরা একটু-আধটু উঁকি-ঝুঁকি পেয়েছি—অনেক পরবর্তীকালে খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে। তবে তা নিতান্তই সামান্য। সেকালের মেয়েলি ছড়া অপভ্রংশ আহট্টা লেখা দু-চারটে পাওয়া যায় এদিক ওদিকে, বিশেষ করে প্রাকৃতপৈঙ্গল নামক প্রাকৃছন্দের বইটিতে। তবে এ বই খুব পুরোনো নয়, চতুর্দশ পঞ্চদশ খ্রীস্টাব্দের। তখন বাংলা ভাষা পরিপুষ্ট হয়ে গেছে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা ভালো করে পড়েছেন তাঁরা জানেন যে, বাংলা ভাষা সরাসরি এসেছে সমসাময়িক কথ্য ও লেখ্য ভাষা অবহট্‌ঠ থেকে আর বাংলা সাহিত্য এসেছে সংস্কৃত ও অবহট্‌ঠ সাহিত্য থেকে। বাংলা সাহিত্যে অবহট্‌ঠ সাহিত্যের প্রভাবের কথা না জানলে ও বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব সকলেই জানেন। যাঁরা বাংলা লিখতেন তাঁরা সংস্কৃতও জানতেন। সুতরাং বাংলা লেখাবার সময় তাঁরা সংস্কৃতের দ্বারা প্রভাবিত হবেন। কিন্তু অবহট্‌ঠর প্রভাব মোটেই স্পষ্টাপষ্টি নয়। এ প্রভাব অনুমান guess নয় deduction—করতে হয় প্রাচীন বাংলা রচনা থেকে। বাংলায় যাঁরা প্রথম সাহিত্য রচনা করেন তাঁদের কেউ কেউ অবহট্‌ঠন কবিতা লিখছিলেন এঁদের এই রচনায় অবহট্‌ঠ ও বাংলায় অবহট্‌ঠের অনুসরণ আছে। তাঁরা যে অবহট্‌ঠের ছড়া ও গানের অনুসরণে ছড়া ও গান লিখেছিলেন তা তাঁদের উক্তি থেকেই বোঝা যায়। এসব প্রাচীনতর ছড়া ও গান যে মেয়েলি সাহিত্যের ভাঁড়ার থেকে নেওয়া তাতে সন্দেহ নেই। যেমন মেয়েলি ছড়া :

সিদ্ধিরখু মই পঢ়মে পঢ়িঅউ
মণ্ড পিঅন্তে বিসরিউ এ সইউ।

অর্থাৎ আমি প্রথমে 'সিদ্ধিরস্তু' অর্থাৎ বর্ণপরিচয় পড়েছিলুম। কিন্তু মাড় ভাত থেকে খেতে, সখী সব ভুলে গেছি।

মেয়েলি গান :

দুলি দুহি পিঠা ধরণ না জাঅ
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ
আঙ্গান ঘরপন শুনে ভো বিয়াতী
কানেট চৌরি নিল অধরাতি।

কাছিমের দুধ দুয়ে কেড়ে উপছে পড়ছে। গাছের তেঁতুল খাচ্ছে কুমিরে। উঠোনে গৃহস্থপনা শোন ওগো বিয়েলি মেয়ে, মাঝ রাতে কানেট চুরি গেল।

মেয়েদের গানের উল্লেখ কালিদাসও করেছেন। তিনি রঘুবংশে বলেছেন যে চাষিদের মেয়েরা পাকা ধানের পাহারা দিতে দিতে রঘুর যশবর্ণনা করে গান গাইত।

সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ ভালো রচনা জয়দেবের গীতগোবিন্দের গানগুলিও প্রাকৃতের মেয়েলি সাহিত্য থেকে এসেছে। তবে তা গ্রাম্য সাহিত্য থেকে নয়। শহুরে অর্থাৎ রাজসভার নটীদের কোষাগার থেকে।

এক

প্রথমেই মনে করিয়ে দিচ্ছি যে এ আলোচনা আমাদের দেশের সাহিত্য নিয়ে।

আমাদের দেশ সাহিত্য শুরু হয়েছে ঋগ্‌বেদের কবিতাগুচ্ছ নিয়ে। এ বস্তু সাহিত্যের বীজ নয়, চারাও নয়—পুরো গজিয়ে ওঠা গাছ। তবে রোপণ করা বটে।

মোটামুটি প্রায় আস্ত রোপণ করা ইরাণের মাটি থেকে ভারতবর্ষের মাটিতে। তার ফলে গাছের পুরোনো পাতা কিছু ঝরে গেছে বটে কিন্তু নতুন পাতা যা গজিয়েছে তা উজ্জ্বল সজীবতায় পৃথিবীর সাহিত্য ইতিহাসে অদ্বিতীয় বাণীশিল্পের প্রাচীনতম নমুনা জাহির করে আছে।

আমাদের সাহিত্যের ইতিহাস ঋগ্‌বেদ থেকে আরম্ভ। ঋগ্‌বেদের কবিতার নাম সূক্ত। রচয়িতা অনেক কবি। আরও অনেকের নাম জানা নেই। এঁদের সকলকে একটি নাম দিয়ে বলা হয় 'ব্রহ্মা'। আমাদের ঐতিহ্যে বলে বেদের সূক্তগুলি ব্রহ্মার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। আমরা ধরছি, 'ব্রহ্মা'কে ঋগ্‌বেদের জানা অজানা সব কবিদের সংযুক্ত তখল্লুস্ বা pen name বা ছদ্মনামরূপে।

গঙ্গার যেমন ত্রিধারা—স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্যে ভাগীরথী আর পাতালে ভোগবতী, ভারতীয় সাহিত্যেরও তেমনি ত্রিকূট হল—'ব্রহ্মা', কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ। আমাদের সাহিত্যের ও সাহিত্য শিল্পের প্রকর্ষের এই তিনটি হল তুঙ্গাতম শৃঙ্গা। আমার এই আলোচনায় এই তেহদ্দির যথার্থতা প্রমাণিত হবে একটি বিশেষ বিষয়ে।

দুই

আমি যতদূর জানি তাতে প্রায় সব দেশের সাহিত্যেই শিশুর আবির্ভাব অনেককাল পরে ঘটেছে। শিশুর আবির্ভাব বলতে শিশুর উল্লেখ অথবা শিশুর বাহাদুরি ধরছি না। শিশুকে শিশু বলেই তাকে ভালোবাসার বিশেষ ইঙ্গিত বা বর্ণনা। শিশুদের বা শিশুদানব প্রায় সব দেশের প্রাচীন সাহিত্যের কাহিনীতে স্থান পেয়েছে, বলেই শিশুর কদর আমাদের দেশেই প্রথম অভিব্যক্ত হয়েছে। এ অভিব্যক্তির ফসিল প্রমাণ আছে ঋগ্‌বেদের কোনো কোনো কবিতায়। কিছু পরিচয় দিই।

গৃহস্থের সংসার নিয়ে দুটি বিশেষ শব্দ আছে ঋগ্‌বেদের কবিতার ভাষায়। এ দুটি শব্দ হল (১) 'পতী দন্' (অথবা উলটো করে দম্‌পতী), বহুবচনে; একবচনে 'পতির দন্' (অথবা উলটো করে দম্পতিঃ), আর (২) 'শিশুর দন্' (এর উলটো রূপ নেই)। শব্দ দুটির মানে হল (১) বহুবচনে 'বাড়ির কর্তাগিন্নি', একবচনে 'বাড়ির কর্তা', আর (২) 'বাড়ির ছেলে'। কর্তা গিন্নি শিশু অথবা বাপ-মা-ছেলে এই তিনটে নিয়েই তো মানব সংসারের চিরন্তন ইউনিট। ঋগ্‌বেদের কালে বিবাহের সঙ্গো সঙ্গো পতিপত্নীর নূতন সংসারে অগ্নিহোত্রের অগ্নি স্থাপন করতে হত। সেই অগ্নি পূজা ছিল গৃহস্থের প্রধান নিত্যকর্ম। এই অগ্নি একদিকে হল গৃহস্থালির মুখ্য উপাদান—রান্নার প্রয়োজনে। অপর দিকে সেই অগ্নি সযত্নে প্রজ্জ্বলিত রাখা ছিল নবজাত শিশুর পালনের মতোই সযত্নকৃত্য। তাই গার্হপত্য অগ্নিই ছিল ঘরের ছেলের প্রতীক। এ ভাবনা বহু যুগ আগেকার, ইন্দো-ইউরোপীয় কাল (খ্রীস্টপূর্ব আনুমানিক ২৫০০ সাল) থেকে চলে এসেছে। ইংরেজিতে এর রেশ রয়ে গেছে home and hearth-এ।

ঋগ্‌বেদের একটি অত্যন্ত বাস্তব ও নীতিগর্ভ কবিতায় (১০-৩৪; জুয়াড়ির

খোদ) একটি উৎপ্রেক্ষায় শিশু চরিত্রের যে গভীর অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে তা কালিদাসের পূব পর্যন্ত সাহিত্যে একেবারে অপ্রত্যাশিত। জুয়াড়ি তার দুর্দশার বর্ণনা করে শেষে জুয়ার ঘুঁটির সম্বন্ধে খেদ করে বলেছে যে তারা 'কুমারদেষ্ণা জয়তঃ পুনঃপুণঃ' অর্থাৎ তারা জিতিয়ে দিয়ে আবার কেড়ে নেয়, শিশুর দানের মতো। (চাইলে ছেলেরা তাদের প্রিয় বস্তু হয়তো দেয়, কিন্তু দিয়েই তা আবার নিয়ে নেয়।)

এখনকার দিনে বাংলা সাহিত্যে যা শিশু সাহিত্য বলে পরিচিত তারও কিঞ্চিৎ আভাস ঋগ্‌বেদে মিলেছে। ঋগ্‌বেদের সপ্তম মণ্ডলে (৫৫ সূক্ত) একটি কবিতা আছে যার মধ্যে ছেলে-ঘুমপাড়ানি ছড়ার সমসাময়িক উপাদান নিহিত আছে। কবিতাটি শুরু হয়েছে বাস্তোষ্পতিকে অর্থাৎ 'বাস্তু বাবাকে বা ঘরের ঠাকুরকে' সম্বোধন করে। মূল ও অনুবাদ দুইই উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।'

অমীবহা বাস্তোষ্পতে বিশ্বা রূপাণি আবিশন্।
সখা সুশেব এধি নঃ।১।।

[অহে বাস্তুপতি, যে তুমি সর্বরোগহর, সকল রূপ ধারণ করে তুমি আমাদের ভালো সখা হও।১।।]

যদ্ অর্জুন সারমেয় দতঃ পিশঙ্গা যচ্ছসে।
বীব প্রাজন্ত ঋষ্টয় উপস্রক্কেষু বপ্‌সতো নি ষু স্বপ।।২।।

[হে সাদা-বাদামি সরমা-পুত্র (কুকুর) যখন তুমি দাঁত চালাও, খাবার সময় মুখের কোন দিয়ে সেগুলি বর্শা ফলকের মতো চকচকে দেখায়।। ঘুমিয়ে পড়।।২।।]

স্তেনং রায় সারমেয় তস্করং বা পুনঃসর।
স্তোতৃন্ ইন্দ্রস্য রায়সি কিম্ অস্মান্ দুচ্ছুনায়সে নি ষু স্বপ।।৩।।

[হে সারমেয়, তুমি চোরকে ভয় দেখাও, তুমি তস্করকেও তাড়া কর। ইন্দ্রের ভক্তদের ভয় দেখায় কেন, কেন তুমি আমাদের বিরুদ্ধ আচরণ করছ? ঘুমিয়ে পড়।।৩।।]

ত্বং সূকরস্য দর্দৃহি তব দর্দর্তু সূকরঃ।
স্তোতৃন্ ইন্দ্রস্য রায়সি কিম্ অস্মান্ দুচ্ছুনায়সে নি ষু স্বপ।।৪।।

[তুমি শূয়ারকে কাটাছেঁড়া কর, শূয়ারও তোমাকে কাটুক-ছিঁড়ুক। ইন্দ্রের ভক্তদের কেন তুমি ভয় দেখাচ্ছ? কেন আমাদের বিরুদ্ধ আচরণ করছ? ঘুমিয়ে পড় ।।৪।।]

সস্তু মাতা সস্তু পিতা সস্তু শ্বা সস্তু বিশ্‌পতিঃ।
সসস্তু সর্বে, জ্ঞাতয় সস্তুয়ম্ অভিতো জনঃ।। ৫ ।।

[মা ঘুমুন, বাবা ঘুমুন, কুকুর ঘুমুক, গাঁয়ের মোড়ল ঘুমুক। জ্ঞাতিরা সব ঘুমুক, আশেপাশের লোক সবাই (ঘুমুক) ।। ৫।।]

য আস্তে যশ্ চ চরতি যশ্ চ পশ্যতি নো জনঃ
তেষাং সং হন্মো অক্ষাণি যয়েসং হর্ম্যং তথা ।। ৬।।

[যে ঠাঁই নিয়ে করে আছে, যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যে চেয়ে আছে তাদের চোখ বুজিয়ে দিই যেমন এই বাড়িটি তেমনি করে ।। ৬।।]

সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো য সমুদ্রাদ্ উদাচরৎ।

তেনা সহস্যেনা বয়ং নি জনান্ স্বাপয়ামসি ।। ৭।।

[হাজার শিঙওলা ষাঁড় যে সমুদ্র থেকে উঠে এসেছে—শক্তিমান্ তার দ্বারা আমরা লোককে ঘুম পাড়িয়ে দিই ।।৭।।]

প্রোষ্ঠেশয়া বহ্যেশয়া নারীর্যা তল্পশীবরীঃ

স্ত্রিয়ো যাঃ পুণ্যগন্ধাস্ তাঃ সর্বা স্বাপয়ামসি ।। ৮।।

[যে নারীরা পাটাতনে শুয়ে আছে, যারা দোলায় শুয়ে আছে, যে নারীরা সুখশয্যায় শুয়ে আছে, যে নারীরা পুণ্যবতী, তাদের সকলকে ঘুম পাড়িয়ে দিই ।। ৮।।।]

ঋগ্‌বেদের সূক্তটির মধ্যে জোড়াতালির চেষ্টা প্রকট এতে আছে তিনটি স্তর। প্রথম স্তর হল প্রথম শ্লোকটি। এটি বাস্তোষ্পতির বন্দনা। ঠিক আগের সূক্তটিও বাস্তোষ্পতির বন্দনা। দ্বিতীয় স্তর হল তারপর তিনটি শ্লোক (২-৪)। এটি একটি ঘুমপাড়ানি ছড়া। এতে ছড়ার ধরনে ধুয়াও আছে—'নি ষুস্বপ' (ঘুমিয়ে পড়)। ছড়াটি শিশুকে উদ্দেশ করে নয়, রাত্রের কুকুরের ডাক যা ঘুম নষ্ট করে তার বিরুদ্ধে মন্ত্রের মতো। তবে শিশু এবং তার মতো অবোধ জনের মন ভোলাবার জন্যেই। বাকি তিনটি শ্লোকে (৫-৭) একটি তুক মন্ত্রের মতো, যেন ঘুমপাড়ানি ছড়ার উপসংহার।

বৈদিক কবির চোখে শিশুর ক্রীড়াচাপল্য ভালো লাগত। তাই ঋগ্‌বেদের কবিতায় মাঝে মাঝে চমৎকার শিশুকথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন মরুদ্‌গণের বর্ণনায় বলা হয়েছে:

শিশুলা ন ক্রীলয়ঃ সুমাতারঃ

['যেন শিশুরা খেলা করছে স্নেহময়ী মায়ের গোচরে।]

আকাশে সূর্য ও চন্দ্রের গতিকে উৎপ্রেক্ষা করা হয়েছে যেন দুটি ছেলে খেলা করছে।

পূর্বাপরং চরতো মায়য়ৈতৌ

শিশূ ক্রীলন্তৌ পরি যাতো অধ্বরম্।।

[দুটি ছেলের মতো এরা দুজন মায়া করে খেলার ছলে ঘুরছে পুব পশ্চিম, আকাশমণ্ডলে।]

মায়েদের কাছে অথবা নিজেরা অলাদা খেলা করছে সোম শিশুর এমন ক্ষণিক ছবি ঋগ্‌বেদে আছে। যেমন,

অধি বাচম্-অক্রত আক্রীলয়ো ন মাতরং তুদন্তঃ

[ক্রীড়ারত ছেলের মতো মাকে ঠেলছে ও চেঁচাচ্ছে।]

সং মাতৃভিরন শিশুর্ বাবৃশানো

[মায়েদের কাছে কাছে ছেলের মতো রয়েছে।]

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণু একীভূত হয়ে গেছেন। 'শিশুর দন' অর্থাৎ

গার্হপত্য (ও যজ্ঞীক) অগ্নির সঙেগ। শিশুরূপে বিষ্ণু দেবগণকে উদ্ধার করেছিলেন অসুরদের হাত থেকে কিন্তু তার বর্ণনায় মানব শিশুর কোনো প্রচেষ্টা দেখা দেয়নি। তা দেখা দিয়েছিল বেশ পরবর্তীকালে পৌরাণিক সাহিত্যে যখন বিষ কষ অভেদ হয়ে পড়েছেন।

আবহমানকালের ভারতীয় সাহিত্যকে যদি পর্বতমালার সঙ্গো তুলনা করা যায় তবে সে পর্বতমালার তিনটি শৃঙ্গা (peak)। এক ঋগ্‌বেদের সূক্ত, দুই কালিদাসের কাব্য-নাটক, তিন রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা ও গল্প। এই তিনটি শৃঙ্গোই শিশুলীলার স্বীকৃতি আছে—তরতমভাবে। ঋগ্‌বেদের কথা বলেছি, এবার কালিদাসের কথা বলি।

রঘুবংশ আরম্ভ হয়েছে রূপকথার অনুযায়ী এক নিঃসন্তান রাজদম্পতির পুত্রকামনা নিয়ে। দিলীপ পত্নী সুদক্ষিণাকে নিয়ে গুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে গেছেন। সেখানে দীনভাবে থেকে গুরুর গাভীর পরিচর্যা করে পুত্রবর লাভ করলেন। রাজ্যে ফিরে এসে রাজা পুত্র-জন্মের অপেক্ষা করছেন। যখন রানীর ছেলে হল তখন রাজা সভায় বসে। খবর পেয়ে তাঁর যে আনন্দ হল তার তীক্ষ্ম উজ্জ্বল বর্ণনা দিয়েছেন কালিদাস অর্ধ-শ্লোকে। যে খবর নিয়ে এল তাকে রাজা সব কিছু দিতে পারতেন, কেবল সাদা ছাদা ও চামর দুটি ছাড়া।

অদেয়ম্ আসীৎ ত্রয়ম্ এব ভূপতেঃ
শশিপ্রভং ছত্রম্ উভে চ চামরে।।

এ তিনটি দ্রব্য হল তাঁর রাজ্যাধিকারের প্রতীক। এ তিনটি তিনি দিতে পারতেন না কেননা এতে তাঁর স্বাধিকার ছিল না। এ পাওয়া পৈতৃক উত্তরাধিকার সূত্রে। সুতরাং এ অধিকার তাঁর উত্তরাধিকারীর জন্যে দায়।

কালিদাস হলেন প্রথম ভারতীয় কবি এবং অনেক শতাব্দী ধরে একমাত্র ভারতীয় কবি যিনি সাধারণ মানব শিশুর প্রথম প্রচেষ্টাকে কাব্যরসে অভিষিক্ত করে এঁকেছেন। শিশু রঘুর উপর দিলীপের ভালোবাসা উপচে পড়েছে তার ছেলেমানুষি কর্ম দেখে।

উবাচ ধাত্র্যা প্রথমোদিতং বচো যযৌ তদীয়াম্‌অবলম্ব্য চাঙ্গুলিম্
বভূব নম্রঃ প্রণিপাত শিক্ষয়া পিতুর্ মূদং তেন ততান সোইর্ভকঃ।।

[ধাইয়ের কথায় সে প্রথম কথা বলত, তার আঙুল ধরে চলত, প্রণাম শেখানোয় মাথা নিচু করত। এই সব করে শিশু তার বাপের আনন্দ বাড়িয়ে দিত।।]

বৈদিক সমাজে পুত্র-সন্তানের বিশেষ প্রয়োজন ছিল শুধু উত্তরাধিকার প্রসারের জন্যেই নয় সংসারে সাহায্যকারী শক্তি (man power) রূপেও বটে। এ প্রয়োজন সর্বকাল সর্বত্র সব দেশেই আছে। অতিরিক্ত প্রয়োজন আছে সভ্য মানুষের পক্ষে। সে হল পতি পত্নীর বিবাহের চরম সার্থকতা। কলমের গাছে ফল ধরা। এ কথা প্রথম কালিদাসই আমাদের শুনিয়েছেন।

রথাঙ্গনাম্মোর্ ইব ভাববন্ধনং বভূব যৎপ্রেম পরস্পরাশ্রয়ম্
বিভক্তম্ অপ্যেকসুতেন তৎতয়োঃ পরস্পরস্যোপ্যুরি পর্যচীয়ত।।

[চক্রবাক দম্পতীর মতো যাঁদের প্রেম পরস্পরকে আশ্রয় করে ভাবের বাঁধনে বেঁধেছিল, এখন একটি পুত্রের জন্মে তা দ্বিখণ্ডিত হয়েও পরস্পরের প্রতি তা বেড়ে উঠল।।]

শিশুর খেলা দেখে নিঃসন্তান পিতার মনোবেদনার প্রকাশ কালিদাস মনোরমভাবে প্রকাশ করছেন তাঁর শকুন্তলা নাটকের একটি শ্লোকে:

প্রলোভ্যবস্তুপ্রণয়প্রসারিতো বিভাতি জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ।
অলক্ষ্যপত্রান্তরসিদ্ধরাগয়া নবোষসা ভিন্নম্ ইবৈকপঙ্কজম্।। ৭,১৪।।

['লোভনীয় বস্তুর লোভে প্রসারিত হাতটির আঙ্গুলগুলি যেন জালি বাঁধা, শোভা পাচ্ছে যেন উষার উদয়ে প্রস্ফুটিত একটি পদ্মের মতো যার অদৃশ্য পাপড়ির মধ্যে দিয়ে অরুণরাগ ফুটে উঠেছে।।]

বেদের সময় থেকে আমাদের সমাজে সমাদর শিশুপুত্রেরই, শিশু-কন্যার নয়। এ বিষয়ে বৈদিক কবির উক্তি উদ্ধৃত করছি—

কৃপণং দুহিতা।
পুত্রো হ জ্যোতিঃ পরমে ব্যোমন্।।

[কন্যাসন্তান কষ্টের কারণ, পুত্রসন্তান পরম ব্যোমে জ্যোতিঃস্বরূপ।।]

এমন সমাজে কন্যাসন্তানের জন্যে স্নেহের স্রোত বইয়ে দিলেন কালিদাস একটিমাত্র শ্লোক লিখে। জন্মকাল থেকে মাতৃপরিত্যক্ত শিশু শকুন্তলাকে মানুষ করেছিলেন তপস্বী কণ্ব অন্তঃসঞ্চিত সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে। সেই শকুন্তলা স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছে, এবং পতিগৃহে যাচ্ছে। তাকে বিদায় দেবার দিনে কণ্বের মনোভাবের সংক্ষিপ্ত অথচ উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন।

যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া
অন্তর্বাষ্প ভরোপরোধি—গদিতং চিন্তাজড়ং দর্শনম্।
বৈক্লব্যং মম তাবদ্ ঈদৃশম্ অহো স্নেহাদ্ অরণ্যৌকসঃ।
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্ নবৈঃ।।

[আজ শকুন্তলা চলে যাবে বলে আমার মন উৎকণ্ঠায় ছেয়ে ফেলেছে। মনের মধ্যে কান্না জড় হয়ে আমার কথা রোধ করছে। ভাবনায় আকুল চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। স্নেহের কারণে আমার মতো বনবাসীর যদি এমন মুহ্যমান অবস্থা হয়, তবে জানি না গৃহস্থ লোকেরা প্রথম মেয়ে পাঠাবার সময়ে কত না কষ্ট পায়।।]

মেঘদূতের একটি শ্লোকে—পরিবর্ধিত হলেও শ্লোকটি যে কালিদাসের রচনা তাতে সন্দেহ নেই—সেকালে মেয়েদের একটি ছেলেখেলার বর্ণনা আছে। এ খেলা এখনও পশ্চিমবঙ্গে লুপ্ত হয়নি। শ্লোকটি এই—

মন্দাকিন্যাঃ সলিলশিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভির্
মন্দারাণাম্ অনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতামুষ্টিনিক্ষেপগূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভির্ অমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ।

[মন্দাকিনীর জলকণামিশ্রিত হাওয়া খেতে খেতে মন্দাকিনীর তীরে তীরে গাছের ছায়ায় তাপ দূর করতে করতে, যেখানে দেবতাবাঞ্ছিত ছোট মেয়েরা একসঙ্গো মিলে খেলা করে মণি নিয়ে সে মণি খুঁজে বার করতে হয় বালির মধ্যে গুঁজে রাখা থেকে।।]

শিশুকে স্তন দেওয়া মাতৃত্বের একটা বড় আনন্দ। এ আনন্দের কথাও কালিদাস আমাদের প্রথম শুনিয়েছেন। রঘুবংশে লক্ষ্মণ যখন অন্তঃসত্ত্বা সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যাগ করে গেলেন, তখন বাল্মীকি তাঁকে মেয়ের মতোই অভ্যর্থনা করলেন। অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের উপযোগী হালকা কাজের ভারও সীতাকে দিলেন— কয়েকটি গাছের চারায় জলসেচ করা। কেন যে একাজ দিলেন তা বাল্মীকি নিজেই জানালেন।

অসংশয়ং প্রাক্ তনয়োপপত্তেঃ
স্তনন্ধয়প্রীতিম্ অবাপ্স্যসি ত্বম্।। ১৪, ৭৮।।

[ছেলে হবার আগে থেকে তুমি এই কাজের দ্বার দিয়েই ছেলেকে স্তন দেবার সুখ পাবে।।]

প্রাকৃত লোকসাহিত্যে কৃষ্ণের শিশুলীলাঘটিত গান ও ছড়া খুব প্রচলিত ছিল। তবে তা প্রধানত আদিরসাত্মক। কালিদাসের পরবর্তীকালে প্রাকৃত কবিতায় মানবশিশুর ছাপ কিছু কিছু পড়েছে দেখা যায়। দু-একটি উদাহরণ দিই গাথাসপ্তশতী থেকে:

গোহ্ণহ পলোঅহ ইমং পহসিঅবঅণা পইস্স জপ্পেই জাআ
সুঅপঢম উব্ভিন্নদন্তজুঅনং কিঅং বোরম্।। ২-১০০।

['নাও দেখ এটা' হাস্যমুখী পত্নী পতিকে বলছে, 'ছেলের প্রথম ওঠা দুটি দাঁতের দাগ লাগা কুল'।।]

নীচের কবিতাটিতে শ্লেষের সাহায্যে শিশু পুত্রের ও কৃষিক্ষেত্রের মূল্য স্বীকৃত হয়েছে চাষিগৃহস্থের কাছে।—

পঙ্কমইল্লেণ ছীবেশঙ্ক পাইণা দিন্নজাণুবড়ণেণ।
আনন্দিজ্জই হলিও পুত্তেন স্ব সালিচ্ছেত্তেণ।। ৬, ৬৭।।

[পুত্র, ধুলোকাদায় মলিন, কেবল দুধ খেয়ে থাকে, হামাগুড়ি দেয়, আর ধানখেত্ পাঁককাদাময়, কেবল ছেঁচ দিতে হয়, হাঁটু গেড়ে তাতে কাজ করতে হয়। এমন তার পুত্র ও ধানখেত নিয়ে চাষি আনন্দে ভোর।।]

নীচে কবিতাটির বৈদিক কবির 'কুমারদেষ্ণ' কথাটির যেন প্রতিধ্বনি শুনি।

জং জং আলিহই মনো আসাবট্টীহি হিঅঅফলঅম্মি।
তং তং বালোব্ব বিহী ণিহুঅং হসিউণ পনহুসই।। ৭, ৫৬।।

[হৃদয়ফলকে আশাকলম দিয়ে মন যা যা লেখে তা অদৃষ্ট (বিধি) ছোটছেলের মতো হেসে চুপি চুপি মুছে দেয়।।]

খ্রীস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী থেকে শিশুকৃষ্ণের মাহাত্ম্য সব দেবতার মাহাত্ম্যকে খর্ব করে দিতে শুরু করেছিল এবং তার আগে থেকেই কৃষ্ণ বিষ্ণুর স্থান অধিকার করেছিলেন। খ্রীস্টীয় অষ্টম-দশম শতাব্দী থেকে বালগোপালের উপাসনা জেঁকে উঠতে থাকে। এর শুরু দক্ষিণ ভারতে। সম্ভবত এখানে খ্রীস্টান ধর্মের প্রভাব আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বালগোপালের উপাসনা প্রায় সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে। চৈতন্যের দাদা গুরু মাধবেন্দ্র পুরী বালগোপালের উপাসক ছিলেন। চৈতন্যের গুরু ঈশ্বরপুরী এবং চৈতন্য নিজেও তাই। এঁরা বালগোপালকে ভজনা করতেন পরম প্রিয়রূপে, অর্থাৎ যেন রাধার ভাবে—(তার মধ্যে যশোধার ভাবও ছিল।) বালগোপালের উপাসনা সাহিত্যে প্রতিফলিত উজ্জ্বলভাবে দেখা গেল ষোড়শ শাতব্দীর প্রথমে চৈতন্য আবির্ভূত হবার পর। বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যে বাৎসল্য শুধু আবির্ভূতই হয়নি বান ডাকিয়েছিল এবং তার প্রধান কারণ চৈতন্য। চৈতন্যকে দেখেই সমসাময়িক বৈষ্ণব কবির অন্তরে বাৎসল্য রসের প্রস্রবণ খুলে গিয়েছিল। একটি সামান্য উদাহরণ দিই। শ্রীচৈতন্যের অনুচর বাসুদেব ঘোষের রচনা।

শচীর আঙিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায়।
বদনে বসন দিয়া বলে লুকাইনু,
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিলু।।
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন গমনে।।

নব্য-ভারতীয় সাহিত্যে শিশুরস প্রথম পাওয়া গেল বাংলায় ও ব্রজবুলিতে লেখা বৈষ্ণব পদাবলীতে। কৃষ্ণের বাল্যলীলা চৈতন্যের ছাপ পেয়ে নতুন করে ফুটে উঠল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে বাংলা সহিত্যে বাৎসল্য-রসের জোগানে কিছু নূতনত্বের আমদানি করলেন রামপ্রসাদ। ইনি গানে আনলেন মায়ের জন্য পুত্রের ব্যাকুলতা। তবে এখানে পুত্র শিশু নয়, বর্ষীয়ান্—তবে ভাব শিশুর। তা ছাড়া এতে যথেষ্ট ভক্তিরস আছে। বেহাগ রাগিনীর নতুন ঢং রামপ্রসাদের গানগুলির মাধুর্য বাড়িয়েছে।

ভারতীয় সাহিত্যের মেরুদণ্ডীয় পর্বতমালার তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ রবীন্দ্রনাথের রচনায় শিশু তার সমগ্র সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য নিয়ে প্রকট হয়েছে। রবীন্দ্র-কাব্যে শিশু তো ঋগ্‌বেদের 'শিশুর দন্' তো বটেই উপরন্তু সৃষ্টির হিরণ্যগর্ভ। জীবন্ত জীবনের

প্রতীক সে, জীবনানন্দের প্রতিমূর্তি সে। রবীন্দ্রনাথের শিশুভাবনা এসেছিল দু পথে। এক তাঁর শৈশবকাল থেকে আত্মভাবনা ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ থেকে। দুই বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবরস থেকে। এই দ্বিপথ অনুসারে রবীন্দ্রনাথের শিশুভাবনা কবিতাগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পড়ে ছেলেমানুষি আচরণ ও ছেলে ভুলোনো ছড়া সম্পর্কিত কবিতাগুলি। দ্বিতীয় ভাগের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের ভাবনা স্নেহাতুর মায়ের মতো, বালগোপালের মুগ্ধ উপাসকের মতো।

বাংলা লোকসাহিত্যের মূল্য, বিশেষ করে ছেলে ভুলানো ছড়ার মহিমা, রবীন্দ্রনাথের মনে সেই প্রথম ধরা পড়েছিল; মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের ছেলেমেয়েদের সঙ্গো বিলাতে ঘনিষ্ঠভাবে থাকার ফলে অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথের মনে বাৎসল্যরসের বোধ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। তাঁর নিজের শৈশবের অনুভূতি, বিশেষ করে দিনের বেলায় চাকরদের শাসনগণ্ডিতে আবদ্ধ থাকায় শিশু রবীন্দ্রনাথের স্নেহাকাঙ্ক্ষা সাধারণ ছেলের চেয়ে অনেক তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়েছিল। বাৎসল্যরস ভাবনাই রবীন্দ্রনাথের কবিতা রচনায় প্রথম পরিপক্বতার সঞ্চার করেছিল। তার প্রমাণ করেছে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে লেখা এবং প্রথম বর্ষ বালকে ছাপা কবিতা দুটিতে,—'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' এবং 'সাত ভাই চম্পা'। পরে কবিতা দুটি কড়ি ও কোমলে সংকলিত হয়েছে।

প্রথম কবিতাটিতে শিশু আনন্দ উদ্ভাসিত হয়েছে আত্মস্মৃতির সৌরভে।

মনে পড়ে ঘরটি আলো মায়ের হাসিমুখ।
মনে পড়ে মেঘের ডাকে গুরুগুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের পরে দৌরাত্ম্যি সে না পায় লেখাজোখা।
ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে শুনেছিলেম গান,
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।

দ্বিতীয় কবিতাটিতে প্রতিফলিত হয়েছে কবির নিঃসঙ্গ শৈশবের অব্যক্ত বেদনা:

মেঘের পানে চেয়ে দেখে মেঘ চলেছে ভেসে,
পাখিগুলি উড়ে উড়ে চলেছে কোন্ দেশে।
প্রজাপতির বাড়ি কোথায় জানে না তো কেউ,
সারাটা দিন কোথায় চলে লক্ষ হাজার ঢেউ।
দুপুরবেলা থেকে থেকে উদাস হল বায়,
শুকনো পাতা খসে পড়ে কোথায় উড়ে যায়।
ফুলের মাঝে গালে হাত দেখছে ভাই বোন,
মায়ের কথা পড়চে মনে কাঁদছে প্রাণ মন।

তারপর? তারপর বছর সাতেক পরে লেখা কবিতা 'যেতে নাহি দিব'। তখন রবীন্দ্রনাথের সন্তান হয়েছে। শৈশবের অনুভূত বেদনারস মিলিয়ে গেছে উচ্ছ্বসিত বাৎসল্যরসে। পিতৃবাৎসল্যের দৃষ্টিতে বিশ্বরূপ দর্শনের মহনীয় মহাকাব্য এই কবিতাটি—

উদাসী

বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়নযুগল
দূর নীলাম্বরে মগ্ন, মুখে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই ম্লান মুখখানি
সেই দ্বার প্রান্তে লীন স্তব্ধ মর্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্যাটির মতো।।

তারপর? তারপর কত বলব। অজস্র কবিতা রয়েছে, 'শিশু' বইখানি রয়েছে। 'শিশু ভোলানাথ'ও রয়েছে। এ সব ছেড়ে দিয়ে শুধু বলছি একটি গদ্য কবিতার কথা, যেটিকে বলতে পারি উপেক্ষিত মানবশিশুর মহা নাটক। কবিতাটির নাম 'ছেলেটা'। রচনাকাল ১৩৩৯।

ছেলেটার বয়স হবে বছর দশেক,
পরের ঘরে মানুষ।...
ছেলেটা কুল পাড়তে গিয়ে গাছের থেকে পড়ে,
হাড় ভাঙে,
বুনো বিষফল খেয়ে ওর ভির্মি লাগে,
রথ দেখতে গিয়ে কোথায় যেতে কোথায় যায়,
কিছুতেই কিছু হয় না,
আধমরা হয়েও বেঁচে ওঠে,
হারিয়ে গিয়ে ফিরে আসে
কাদা মেখে কাপড় ছিঁড়ে;
মার খায় দমাদম,
গাল খায় অজস্র,
ছাড়া পেলেই আবার দেয় দৌড়।
মরা নদীর বাঁকে দাম জমেছে বিস্তর....
ছেলেটার খেয়াল হল ঐখানে ডুব দিতে....
কী আছে দেখিই না, সবতাতে এই তার লোভ।
দিল ডুব, দামে গেল জড়িয়ে

চেঁচিয়ে উঠে, খাবি খেয়ে, তলিয়ে গেল কোথায়।
জেলেদের ডিঙি নিয়ে টানাটানি করে তুলল তাকে
তখন সে নিঃসাড়।
তারপরে অনেকদিন ধরে মনে পড়েছে
চোখে কী করে সর্ষে ফুল দেখে,
আঁধার হয়ে আসে,
যে মাকে কচি বেলায় হারিয়েছে
তার ছবি জাগে মনে,
জ্ঞান যায় মিলিয়ে।
ভারী মজা,
কী করে মরে সেই কথাটা।—
বক্‌সিদের ফলের বাগান, সেখানে লুকিয়ে যায় জন্তুর মতো,
মার খেয়েছে বিস্তর, জাম খেয়েছে আরও অনেক বেশি।
'বাড়ির লোকে বলে, 'লজ্জা করে না বাঁদর?
কেন লজ্জা
বক্‌সিদের খোঁড়া ছেলে তো ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে ফল পাড়ে,
ঝুড়ি ভরে নিয়ে যায়
গাছের ডাল যায় ভেঙে,
ফল যায় দলে,
লজ্জা করে না?
একদিন পাকড়াশিদের মেজো ছেলে একটা কাঁচ-পরানো চোঙ নিয়ে
ওকে বলে, 'দেখ না ভিতর বাগে।'
দেখল নানা রং সাজানো
নাড়া দিলেই নতুন হয়ে ওঠে।
বললে, দে-না ভাই আমাকে।
তোকে দেব আমার ঘষা ঝিনুক,
কাঁচা আম ছাড়াবি মজা করে,
আর দেব আমের কষির বাঁশি
দিল না ওকে।
কাজেই চুরি করে আনতে হল।....
ভয় নেই, ঘৃণা নেই ওর দেহটাতে
কোলাব্যাং তুলে ধরে খপ করে,

বাগানে আছে খোঁটা পোঁতার এক গর্ত,
তার মধ্যে সেটা পোষে,
পোকামাকড় দেয় খেতে।...
ইস্কুলে যায় পকেটে নিয়ে
কাঠবিড়ালি।.....

একটা কুকুর ছিল ওর পোষা,
কুলীনজাতের নয়
একেবারে বঙ্গাজ।
চেহারা প্রায় মনিবেরই মতো
ব্যবহারটাও।
অন্ন জুটত না সব সময়ে
গতি ছিল না চুরি ছাড়া;

রবীন্দ্রনাথের কবিসত্ত্ব জীবন ও জগৎকে দেখেছিলেন নবজাত শিশুর অহেতু-আনন্দ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে। একথা তিনি তার কবিতায় গানে বার বার বলে গেছেন। যেমন ধরুন, 'বিচিত্রা' কবিতায় (রচনাকাল ১৩৩৪)—

ছিলেম যবে মায়ের কোলে,
বাঁশি বাজানো শিখাবে বলে
চোরাই করে এনেছ মোরে তুমি,
বিচিত্রা হে, বিচিত্রা,
যেখানে তব রঙের রঙ্গভূমি।
আকাশ তলে এলায়ে কেশ
বাজালে বাঁশি চুপে,
সে মায়া-সুরে স্বপ্নছবি
জাগিল কত রূপে;
লক্ষ হারা মিলিল তারা
রূপকথার বাটে;
পারায়ে গেল ধুলির সীমা
তেপান্তরি মাঠে।...

এই তো কবিসত্ত্বের ভুবনের বঙ্গাভূমিতে প্রবেশ। এখান থেকে আর নিষ্ক্রমণ হয় নি। তাই 'রূপকথায়' কবিতায় বা গানে (রচনাকাল ১৯৪০) বলেছেন,

কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা
মনে মনে।

সূর্য যখন অস্তে পড়ে ঢুলি
মেঘে মেঘে আকাশকুসুম তুলি।
সাত সাগরের ফেনায় ফেনায় মিশে
যাই ভেসে দূর দিশে,
পরির দেশের বন্ধ দুয়ার দিই হানা
মনে মনে।

৩. *শৈশবের সাহিত্য*

ভাষা ও সাহিত্যের জন্মকালে শিশুর জন্যে আদিম রচনার উল্লেখ প্রথম প্রস্তাবে করেছি। তারপর গল্পের বিবর্তনে দেখিয়েছি যে তার উদ্দিষ্ট ছিল ছেলে বুড়ো সবাই। তবে সে সব গল্পের বোদ্ধা হতে গেলে একটু বয়স হওয়া চাই। নিতান্ত কমবয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্যে রচনা সাহিত্যে দেখা দিয়েছে বেশ কিছুকাল পরে। আজকে সেই কথাই বলব।

ঘুমপাড়ানি গল্পের অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাই দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে। তখন বালগোপালের উপাসনা চালু হয়ে গেছে। বিদ্যাকরের 'সুভাষিত রত্নকোশ' বইটিতে কবি শতানন্দের একটি শ্লোক থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।

শ্যামোচ্চন্দ্রা স্বপিষিমন শিজো চৈতি মাম্ অম্ব নিদ্রা
নির্দ্রোহেতোঃ সদৃণু সূত কথাং কাম্ অপূর্বং কুরুসত্ব
বামো নাম ক্ষিতিপতির্ অভূন্ মাননীয়ো রঘূণাম্
ইত্যুক্তস্য স্মিতম্ অবতু বো দেবকীনন্দনস্য।।

('অমাবস্যার রাত, চাঁদ উঠেছে। ছেলে, তুমি এখনো ঘুমিয়ে পড়ছ না যে?' 'ঘুম আমার আসছে না, মা।' 'ঘুম আসবে, ছেলে। একটা গল্প শোন।' 'কোনো নতুন গল্প কর।' 'রঘুদের বংশে এক মাননীয় রাজা জন্মেছিলেন রাম নামে।' এইটুকু শুনেই দেবকীপুত্রের মুখে হাসি ফুটল। সেই হাসি তোমাদের রক্ষা করুক।।")

বাংলায় শিশু কবিতা প্রথম পাচ্ছি কবিকঙ্কণ মুকুন্দের লেখনী থেকে। শিশু শ্রীমন্তকে ভোলাবার জন্যে তার মা খুল্লনা—এই ছেলেভোলানো পদটি গেয়েছিলেন।

আরে বাছা আয় আয় আয়
কি লাগি কান্দে মোর শ্রীমন্ত রায়।
আনিব তুলিয়া গগন ফুল
একেক ফুলের লক্ষেক মূল।
সে ফুল গাঁথিয়া পরাব হার
সোনার বাছা মোর না কান্দ আর।
গগন মন্ডলে আড়িব ফান্দ
বান্ধিয়া দিব তোরে শারদ চান্দ।

কপালে দিব তোরে সে চান্দ ফোঁটা
খেলাতে দিব বাছা সোনার ভেটা।
খাওয়াব ক্ষীরখণ্ড পরাব চুয়া
কর্পূর পাকা পান সরস গুয়া।
রথ তুরঙ্গা যৌতুক দিয়া
রাজার দুই কন্যা করাব বিয়া।
শ্রীমন্ত চাপিবে বিনোদ নায়
কস্তুরি কুঙ্কুম চন্দন গায়
সুখে নিদ্রা যান চামর বায়
শ্রীকবিকঙ্কণ মুকুন্দ গায়।

কবিতাটি খাঁটি নার্সারি রাইমের কাঠামোয় গড়া।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে যে আমাদের দেশে, বাংলাদেশে ও আশেপাশের অঞ্চলে ছেলে ও বুড়ো ভোলানো গান-গল্প যে অনেক রকম ও প্রচুর প্রচলিত ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কিছু কিছু গল্প সংগ্রহ করে এবং সেগুলি সংস্কৃতে অনুবাদ করে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে মিথিলায় একটি বই লেখা হয়েছিল। বইটি বিদ্যাপতির নামে চলে। বইটি নাম 'পুরুষ পরীক্ষা'। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক হরপ্রসাদ রায় বইটি বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। এ অনুবাদ ছাপা হয়েছিল। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে।

ভ্রষ্ট সংস্কৃতে লেখা 'সেকশুভোদয়া' নামক একটি পুস্তকেও (রচনাকাল ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দী) কয়েকটি লৌকিক গল্প আছে। অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধি সময়ে আমাদের দেশে যেসব গল্প প্রচলিত ছিল সেগুলির একটি নির্বাচিত সংকলন করেছিলেন কেরি। শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে ছাপা হয়েছিল। নাম 'ইতিহাসমালা'। (তখন 'ইতিহাস' শব্দের পণ্ডিত মহলে প্রচলিত অর্থ ছিল 'কাহিনী, গল্প'।) পরম দুঃখের বিষয় যে, বইটি ছাপা হয়েছিল বটে কিন্তু প্রচারিত (published) হয়নি। তার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং কেরি সাহেব দুই পার্টিই ন্যায্য প্রাপ্য প্রশংসা থেকে বঞ্চিত হয়ে এসেছে। ওই ১৮১২ সালে ইয়াকোব ও উইল্‌হেলম গ্রিমের জার্মান উপকথার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়ে ইউরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে নবীন প্রাণের সঞ্চার করেছিল। গ্রিম দু ভাই যে কাজ করেছিলেন তাঁদের মাতৃভাষার পক্ষে, সেই কাজই করেছিলেন কেরি তাঁর সহকারীদের সাহায্যে তাঁর বিমাতৃ ও প্রিয় ভাষার পক্ষে। আরও খেদের বিষয় এই যে, বইটি কোনো ইউরোপীয় বিদগ্ধ পণ্ডিতের গোচরে আসেনি বটে তবে বর্তমান শতাব্দীর একাধিক বাঙালী পণ্ডিত এ বইটি দেখেছিলেন, তবুও তাঁরা বইটির মূল্য বুঝতে পারেননি। জ্ঞানের চশমা বোধকরি কখনো কখনো ঠুলির কাজ করে।

ইতিহাসমালায় ছোট বড়ো দেড়শো গল্প সংকলিত আছে। কোনো কোনো গল্প পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ থেকে নেওয়া। অনেকগুলি গল্প বর্ষীয়ানদের উপভোগ্য। কতকগুলি গল্প ছেলে-বুড়ো দুয়েরই আনন্দদায়ক। কোনো কোনো লৌকিক গল্প পরবর্তীকালে সংগৃহীত উপকথা সংকলনের মিলেছে। কয়েকটি আর কোথাও মেলেনি। এমনি কিছু গল্পের পরিচয় দিই। তার থেকে বইটির মূল্য কিছু উপলব্ধি হবে। বলে রাখি ইতিহাস মালার গল্পগুলি সব সংক্ষেপে লেখা।

প্রথমে যে গল্পটি বলছি তার একটু বিশেষ মূল্য আছে আধুনিক কালের ডিটেকটিভ সাহিত্যের পক্ষে। ক্ষুদ্র কাহিনীতে এই তত্ত্বকথা পাওয়া যায় যে, ১. অপরাধী অপরাধ করে কিছুকাল অপরাধ স্থানের কাছে ঘোরাফেরা করে এবং ২. অপরাধী নিজেকে প্রবল বুদ্ধিমান মনে করে সে কৌতূহলী হয়ে বিপদে পড়ে। এখন গল্পটি যথাযথ বলছি। গল্প সংখ্যা ১১। কোনো গল্পেই শিরোনামা নেই।

> কোন এক নগরে কোন এক ঘাটের উপর এক ব্রাহ্মণ একশত টাকার এক তোড়া বস্ত্রে রাখিয়া স্নান করিতে জলে নাম্বিলে পর ডুব দিয়া উঠিয়া দেখে আপন বস্ত্রে তঙ্কার তোড়া নাই ইহাতে বড় দুঃখী হইয়া এই স্থানের বিচারকর্তার স্থানে নিবেদন করিলে তিনি আপন অন্তঃকরণে বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা দিলেন এবং পাঁচজন পেয়াদা ও দুইজন কোড়াবরদার তাহার সাতে দিয়া আজ্ঞা করিয়া দিলেন, যে স্থানে ব্রাহ্মণ তাহার তোড়া রাখিয়াছিল সে স্থানে পেয়াদারা ঘিরিয়া থাকহ এবং তথা কোড়া ক্ষেপণ করহ।
>
> তারপরে তাহারা সেইমত করিল যে টাকা লইয়াছে সে এক ভারি জল বহা গোয়ালা সেই স্থানে আসিয়া বলিল যে তোমরা এই স্থানে কোড়া মারিলে কি তোমাদের টাকা পাইবা তখন পেয়াদারা বলিল আমরা টাকা পাইবার ফিকির করিতেছি তুই কি মতে জ্ঞাত হইলি এই কহিয়া তাহাকে কর্তার সাক্ষাৎ লইয়া প্রহার করিলে গোপ সে টাকা ফিরিয়া দিল। এই কৌশলে তথাকার বিচারকর্তা কাঙ্গালি ব্রাহ্মণের হারাণিয়া মুদ্রা দেওয়াতে ব্রাহ্মণ বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

শিয়াল পন্ডিতের পাঠশালায় কুমিরের ছেলে ভর্তির গল্পটি আছে (২৩) এইভাবে :

> দক্ষিণ দেশেতে পুন্নাগ নাগকেশরা গুরুগম্ভীরা শোকশোভিত বনসুন্দরীগণ বিলসিতাত্যন্ত মনোহর দ্বিরদাম্পদ নামে বন ছিল। একদা এক দীর্ঘিকাস্থ কুম্ভীরের সপ্তসংখ্যক বানাপত্য দেখিয়া ঐ বনস্থ এক শৃগাল লোভাকৃষ্টচিত্ত হইয়া কুম্ভীরকে কহিল, হে কুম্ভীর, তোমার বালক সকল মূর্খ—অতএব আমার নিকট পাঠ করিতে দেহ, আমার নাম শিবরাম পন্ডিত, ছয় মাসের মধ্যেই পন্ডিত করিয়া দিব। স্বচ্ছন্দে মৎস্যাদি আহার করিবেক এবং মনুষ্য কর্তৃক নষ্ট কদাচ হইবে না।

তাহাতে কুম্ভীর মূর্খতাপ্রযুক্ত তুষ্ট হইয়া ঐ সপ্ত সংখ্যক অপত্য শৃগালের হস্তে সমর্পণ করিল। শৃগাল গর্ত মধ্যে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে ছয়টি ভক্ষণ করিয়া একটি রাখিল। যে সময় কুম্ভীর পুত্র সকল দেখিতে আইসে সে ক্ষণে ঐ একটি বার বার উঠাইয়া দেখাইয়া পুনর্বার গর্ত মধ্যে রাখে কুম্ভীর তুষ্ট হইয়া গমন করে পরে সপ্তম কুম্ভীর শিশু ভক্ষণ করিয়া শৃগাল পলাইল।

গল্পটি পরবর্তীকালে শিশুপাঠ্য বইগুলিতে যেভাবে ছাপা হয়েছে তার থেকে ইতিহাসমালার গল্পটিতে একটু বিশেষত্ব আছে। প্রচলিত বইয়ের গল্পে কুমির ছানাদের শিয়াল পন্ডিতের পাঠশালায় পড়াবার কোন কারণ বলা নেই। এখানে তা আছে পাঠশালায় পড়ে পন্ডিত হলে কুমির ছানারা মানুষের মার এড়িয়ে স্বচ্ছন্দে পুকুরের মাছ ধ্বংস করতে পারবে।

এখন একটি অভিনব গল্পের উল্লেখ করছি (১০৪)। ভেবে দেখলে আজকের দিনে গল্পটির কিছু প্রতীকী তাৎপর্য থাকতে পারে।

পূর্বদেশে এক রাজা এক দিবস আপন সভা মধ্যে বসিয়া প্রশ্ন করিলেন যে বুদ্ধি বড় কি লক্ষ্মী বড়। তাহাতে সভাসদ উৎপন্নবুদ্ধি এক পন্ডিত কহিলেন বুদ্ধি বড়। বুদ্ধি ব্যতিরেকে কোন কর্ম হয় না। ধনপতি নামে এক মন্ত্রী কহিলেন, সকল হইতে লক্ষ্মী বড়—যাহা হইতে সকল সুখ এবং মান্যতা হয়।

এই প্রকার বাদানুবাদ হইলে উৎপন্নবুদ্ধি কহিলেন হে মহারাজ এই প্রশ্নের এক বৃত্তান্ত শুনুন—

পূর্বে লক্ষ্মীতে আর বুদ্ধিতে এইরূপ আত্মবিরোধ হইয়া একত্র পথে যাইতে ধান্যক্ষেত্রে পরম সুন্দর যুবা একজন কৃষক হল প্রবাহ করিতেছে তাহাকে দেখিয়া লক্ষ্মী বুদ্ধিকে কহিলেন তুমি কেমন বড় (।) তুমি না থাকিলে কি মন্দ হয় দেখিব। পরে লক্ষ্মীর অনুগ্রহতে তৎক্ষণে ক্ষেত্রে মৃত্তিকা সকল স্বর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। কৃষক সেই স্বর্ণ দ্বারা অত্যন্ত ধনবান হইল এবং ক্রমেতে সম্পন্ন হইয়া সুখ ভোগ করিতে লাগিল। পরে নরপতি নামে রাজার এক কন্যা অপূর্ব সুন্দরী পণ্ডিতা কিন্তু অবিবাহিতা। তাহার বিবাহের নিয়ম এই : প্রথম দিনে আলাপে ও ব্যবহারে যে উত্তম হইবেক তাহাকেই বিবাহ করিবেন (।) নতুবা মূর্খ হইলে সেখানে এক দেবী আছেন তাঁহার নিকটে তাহাকে বলিদান করিবেন। পবে নির্বোধ কৃষক ধন গর্বেতে আপনাকে সুবুদ্ধি জানিয়া সসজ্জ হইয়া বিবাহার্থে তথায় উপস্থিত হইল। রাজকন্যার গৃহে গিয়া বিচিত্র আসনাদি ও শয্যা ও উত্তম খড়্গাদি অস্ত্র সকল দেখিয়া কৃষক ভীত হইয়া অন্য আলাপ করিতে না পারিয়া প্রথমতঃ লৌহের চৈক্কণ্য

দেখিয়া কহিতেছে আ কি উত্তম লৌহ। ইহাতে ভাল ভাল লাঙ্গল হইতে পারে।

এমত এমত কৃষকতার বাক্য শুনিয়া এবং মূর্খের ব্যবহার দেখিয়া রাজকন্যা খড়্গ লইয়া সেই দেবীর নিকটে তাহাকে বলি দিতে উদ্যতা হইলে বুদ্ধি লক্ষ্মীকে কহিলেন, তোমার কৃষক আমা ব্যতীত নষ্ট হয় তখন লক্ষ্মী বুদ্ধিকে কহিলেন বুঝিলাম তুমিই আমার বড় এখন শীঘ্র গিয়া রক্ষা কর। বুদ্ধি তৎক্ষণে গিয়া কৃষকের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অপূর্ব জ্ঞানোদয় হইয়া বাক্যের কৌশলেতে রাজকন্যা সন্তুষ্ট হইয়া খড়্গ ত্যাগ করিয়া কৃষককে বিবাহ করিয়া একত্র বাস করিতে লাগিল ইতি।

যাকে ছেলে ভুলানো গল্প বলে, অর্থাৎ যাতে সুয়োরানী রাক্ষস খোক্কস ইত্যাদি পাত্রপাত্রী আছে এমন গল্প ইতিহাসমালায় নেই তবে আর সব রকম গল্পই আছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যে গল্পটি তা যে কোনো ভারতীয় গল্প সঙ্কলনে একেবারেই অনপেক্ষিত। এটি ছেলে ভুলানো তো নয়ই উপরন্তু তাদের পাঠযোগ্যও নয়। অত্যন্ত নিষ্ঠুর অশালীন গল্প। গল্পটি (৩২) অদৃষ্টের দারুণ নিষ্ঠুরতার কথা। গল্পটির বিশেষত্ব এই যে গল্পটি পাওয়া গেছে প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ 'মহাবস্তু'তে (রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী)। খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে এ দেশের গল্পটি একটানা প্রায় দু' হাজার বছর চলে এসেছে।

ছেলে ভুলানো গল্প বাংলায় 'রূপকথা' নামে চলে। এই নামটি আমি প্রথম পেয়েছি রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উক্তিতে। 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকায় দ্বিতীয় পর্বে (সংবৎ ১৯২১—১৮৬৪-৬৫) ২১ খণ্ডে (অর্থাৎ সংখ্যায়) বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর সমালোচনায় তিনি এই কথা লিখেছেন :

> ... ফলে এক্ষনকার গ্রন্থকারেরা আমাদিগের এক প্রাচীনা কুটুম্বিনীর সদৃশ বোধ হল। ঐ কুটুম্বিনীর নিকট আমরা বাল্যাকালে "রূপকথা" শুনিতাম এবং তিনি প্রত্যহ আমাদিগাকে কহিতেন, "এক রাজার দুই রাণী, সো আর দো, সোকে রাজা বড় ভালবাসিতেন, দোকে দেখিতে পারিতেন না।"

বাংলার অন্তঃপুরের শিশু দরবার থেকে রূপকথাকে বাইরে এনে বিশ্ববাসীর সামনে ধরে দিলেন লালবেহারী দে ১৮৮৫ (?) সালে Folk tales of Bengal লিখে। ইংরেজিতে রূপান্তরিত হলেও এই গল্পগুলির নিজস্ব সৌরভ যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ আছে। আমার মনে হয় এই বইটি পড়েই রবীন্দ্রনাথ বাংলা রূপকথা ও ছড়ার দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' ও 'সাত ভাই চম্পা' কবিতা দুটি লেখা হয়। গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত Vernacular Literature Society 'ভাষানুবাদক সমাজ' (১৮৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত) ছেলেদের পড়বার জন্যে কিছু বিলাতি গল্প-গ্রন্থের অনুবাদ

সস্তায় প্রকাশ করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল রবিনসন ক্রুশো, ক্রীলফেল গল্প এবং কিছু কিছু এণ্ডারসনের গল্প। দেশি গল্পের মধ্যে বেরিয়েছিল আরব্য উপন্যাস। এর বেশ কিছুকাল পরে ছেলেদের জন্যে গল্প লেখায় মন দেন শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো দু-একজন ব্রাহ্ম শিক্ষিত বিদগ্ধ ব্যক্তি। এঁরা 'রূপকথা'-র স্পর্শ সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ সুয়োরানী-দুয়োরানীর কথা ভুলতে পারেননি।

দে সাহেবের বই বার হবার বারো বছর পরে এক নবীন বাঙালী স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ খেয়ে বাংলার অন্তঃপুরের রূপকথাকে যথাযথ সাজে এবং অবিকৃতভাবে প্রকাশ করলেন এবং এঁর নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এর নিবাস ছিল হুগলি জেলায় গরলগাছা গ্রামে। ইনি 'ছেলে ভুলানো গল্পের তরঙ্গ' শীর্ষক দিয়ে দুটি ছোট ছোট বই বার করলেন যাতে পশ্চিমবঙ্গের রূপকথার যথাসম্ভব সামগ্রিক স্বরূপ প্রকাশিত হল। বই দুটির নাম 'রাক্ষস-খোক্ষস' (প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩০৪/১৮৯৭) ও 'ভূত-পেত্নী' (১৩০৭)। আশুতোষ কী উদ্দেশ্য নিয়ে গল্প সংকলন দুটি করেছিলেন তা প্রথম বইটির ভূমিকায় গ্রন্থকার দিয়েছেন। এখানে সেটি উদ্ধৃত করছি—

> ছেলেরা গল্প ভালবাসে, কিন্তু গল্প শুনাইবার বুড়াবুড়ি আর মেলে না। আজকালকার ঠাকুমা ঠাকুরদাদারা নাতি নাতনীদের লইয়া আর সেকালকার 'ছেলে ভুলানো গল্প' শুনাইতে ভালবাসেন না। কাজেই কালের আবর্তনস্রোতে সেই গল্পগুলি ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া 'রাক্ষস-খোক্ষস' বাহির হইল, কিন্তু ইহাকে ছেলেরা ভয় না করিয়া ভালবাসিবে।
>
> আজকাল চারিদিক হইতে গল্প ও ছবির বই বাহির হইতেছে, কিন্তু সেগুলি বিভিন্ন ভাবাপন্ন। আমাদের দেশের প্রচলিত সুমধুর ' ছেলে ভুলান গল্প'গুলির উদ্ধার সাধন করা বাঙালীর একটি কর্তব্য ও পুণ্যকর্ম। সেই ব্রত উদ্‌যাপনে আজ উদ্যোগী হইয়াছি। কতদূর কৃতকর্ম হইয়াছি তাহার বিচারভার গুণিগণের হস্তে।
>
> কয়েক বৎসর পূর্বে 'রেভারেণ্ড লালবিহারী দে মহোদয় তাঁহার 'ফোক্ টেলস্ অফ বেঙ্গাল' (Folk Tales of Bengal) নামক প্রাচীনকালের এই গল্পগুলির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বোধহয় তিনি সভ্যতাভিমানী বঙ্গবাসীর নিকট আদর পাইবেন না ভাবিয়া বিজাতীয় ভাষায় লিখিয়াছিলেন। কিন্তু আজ আমাদের রুচির পরিবর্তন হইয়াছে। বঙ্গভাষার প্রতি আর নাসিকা কুঞ্চিত করি না। অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার আর ভয় নাই। তাই সাহসে নির্ভর করিয়া লুপ্ত রত্নের উদ্ধার সাধনে ব্রতী হইলাম। পূর্বে সাহিত্য জগতের অন্তরালে নিহিত ছড়াগুলির উদ্ধার করিয়াছি। এক্ষণে ছেলে ভুলান গল্পগুলির

অন্তর্গত "রাক্ষস-খোক্ষস" বাহির হইল। ভবিষ্যতে অন্য রত্নের উদ্ধার কল্পে ব্রতী রহিলাম।

এক্ষণে যাহাদের জন্য এ গল্পগুলি প্রকাশিত হইল, তাহারা ইহা লইয়া হাসি মুখ দেখাইলে ভাগ্যবান মনে করিব। ইতি—

গ্রন্থকারের দাবি কিছুমাত্র অন্যায় নয়। গল্পগুলি মেয়েদের মুখ থেকে যেন টাটকা ধরা হয়েছে। ভাষায় আঞ্চলিক রূপ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। সংকলনকারী কিছুমাত্র কবিত্ব করতে চেষ্টা করেননি। আর সমাদর? বেশ সমাদর হয়েছিল সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির সংসারে। কেবল দুরন্ত শিক্ষিত ব্যক্তিরা উদাসীন ছিলেন। তাঁরা বই দুটি পড়েননি। তার ফলে দেখছি যে, এ বিষয়ে যেসব গবেষণার বই লেখা হয়েছে তার কোনটিতেই আশুতোষের কোনো বই আমল পায়নি। এই তো আমাদের উচ্চ শিক্ষা ও আধুনিক সংস্কৃতি।

গল্প বলার মেয়েলি ভঙ্গি ও ভাষার উদাহরণ রূপে একটি ছোট গল্প আপনাদের শোনাচ্ছি। গল্পটির নাম 'পেত্নীর আলতা পরা', ভূত-পেত্নীতে সঙ্কলিত।

এক পেত্নীর বে হ'য়েছে, সে শ্বশুরবাড়ী যাবে। শ্বশুরবাড়ী যা'বার আগে পেত্নীর আলতা পরবার সাধ হলো। পেত্নী আলতা পরবে কি করে, এই কথা ভাবচে, এমন সময় এক নাপ্তিনী সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে সেই পেত্নীকে দেখে নাপ্তিনী যেমনি পালাবে, অমনি পেত্নী তার সামনে এসে বল্লে, "দেঁ আঁমার কাঁমইয়ে দেঁ, আর কঁড়ি নেঁ।" এই কথা শুনেই নাপ্তিনীর মুখ শুকিয়ে গেল, সে কি করে. কিছুই ঠিক করতে পাল্লে না। পালাতেও পারে না, পালালেই পেত্নীর পেটের ভিতর যেতে হবে। আর কি করেই বা কামইয়ে দেয়, তার কাছে আলতা নেই। সে অনেক ভেবে চিন্তে একটা বুদ্ধি ক'ল্লে। নাপ্তিনী পেত্নীকে বল্লে, "আচ্ছা, পা কামইয়ে দিচ্ছি, কিন্তু দেখো, আমি যেমন বলবো, তোমাকে তেমনি করে থাকতে হবে। পা কামানর আগে মাস তোলাটা বড় শক্ত।"

এই কথা শুনে সেই পেত্নী বল্লে, "আঁচ্ছা, তুঁই যেমনি বঁলবি আঁমি তেঁমন কঁরে থাঁকবো। এঁখন শীগ্‌গির পাঁ কাঁমাইয়ে দেঁ।"

"আচ্ছা দিচ্ছি", এই বলে নাপ্তিনী পেত্নীর পায়ের মাস তুলতে আরম্ভ ক'ল্লে। শেষে এম্‌নি মাস তুলতে লাগলো যে পেত্নীর পা থেকে রক্ত পড়তে লাগ্‌লো। তখন পেত্নী কিছু বল্‌তে পাল্লে না। তারপর যখন দর্ দর্ করে খুব রক্ত পড়তে লাগলো, তখন পেত্নী অনেক কষ্টে বল্লে, "আঁর আঁমার পাঁ কামানয় কাঁজ নেঁই রেঁ, মাঁস তোঁলাইতে টেঁকলে বাঁচি।" তখন নাপতিনী

বল্লে, "আর বেশী দেরি নেই, এইবার আল্‌তা পরিয়ে দিচ্ছি।" এই কথা বলে সেই রক্ত দিয়েই আল্‌তা পরানর মত করে দিল।

তখন নাপ্‌তিনী বল্লে, "আমার কড়ি কই?" পেত্নী তখন নাপ্‌তিনীর আঁচলে এক থালা কড়ি ঢেলে দিল। নাপ্‌তিনীও কড়িগুলো আঁচলে বেঁধে নিলে। তারপর সেই পেত্নী অতি কষ্টে একটা গাছে গিয়ে উঠলো। গাছে উঠে সেই পেত্নী মনে করতে লাগলো, বাঃ বেশ আল্‌তা পরান হয়েছে।

এদিকে যেমন পেত্নী গিয়ে গাছে উঠলো অমনি নাপ্‌তিনী এক দৌড়ে ঘরে গিয়ে খিল দিলো। তারপর পেত্নী উড়ে উড়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে লাগলো।

গল্পটি বলা হয়েছে লেখকের অঞ্চলে প্রচলিত ভাষার ছাঁদে এবং পরিপূর্ণ মেয়েলি ভঙ্গিতে। এমন বস্তুশব্দবিদদের পরম উপভোগ্য—আর কোথাও ইতিমধ্যে দেখিনি বাংলা সাহিত্যে। একটি শব্দ লেখক যথাযথভাবে দিতে চেষ্টা করেছেন নিজের মতো করে।—"কামইয়ে"। এটি বোধ হয় সাধারণ পাঠক চট করে বুঝতে পারবেন না। কেন লেখক "কামিয়ে" না লিখে বার বার লিখেছেন "কামইয়ে", লিখেছেন এই কারণে যে, তাঁর আঞ্চলিক উপভাষায় কথাটির উচ্চারণ ছিল "কাম্যে"। এই উচ্চারণই তিনি জ্ঞাপন করেছেন "কামইয়ে" (অর্থাৎ কাম্‌ইয়ে) লিখে। তার জন্যে শব্দ বিদ্যাব্যবসায়ী আমি লেখককে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পরে অনেক ভালো ভালো রূপকথার সংগ্রহ ও সংকলন বার হয়েছে কিন্তু সেগুলির কোনটির ভাষা, ভঙ্গি ও ভাব অবিকৃত নেই। কেউ কবিত্ব করেছেন, কেউ ভাষাকে সাধুত্বে মণ্ডিত করেছেন, কেউ বা সাহিত্যের চলিত ভাষায় সর্বজনগ্রাহ্য করে প্রকাশ করেছেন। এঁদের রচনার আলোচনা যথেষ্ট হয়েছে। এখানে আমি তা করছি না। অতঃপর আমি শুধু একজনের বিষয়েই আলোচনা করব। তিনি যোগীন্দ্রনাথ সরকার। শিশু সাহিত্যের আলোচনায় যাঁদের নাম নিয়ে নাড়াচাড়া হয় তাঁদের প্রায় সকলেরই ইনি অগ্রজ এবং পথ-প্রদর্শক। কিন্তু উপেক্ষিত। সেইজন্যেই এঁর কথা আমি বলব। ইনিও ব্রাহ্ম ছিলেন এবং সুয়ো-রানী দুয়ো-রানীকে প্রত্যাখ্যান করেছেন কিন্তু ভূতকে একেবারে ছাড়াতে পারেননি।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭) ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ছবি ও গল্প' প্রকাশ করেছিলেন। এতে তাঁর নিজের এবং আরও অনেকের রচনা আছে। যোগীন্দ্রনাথের নিজের রচনার মধ্যে আছে কিছু কবিতা (ইনি প্রথম জীবনে কবিতা লিখতেন—) একটি বালক পাঠ্য ছোট উপন্যাস, কিছু গল্প আর কয়েকটি সরসভাবে লেখা বর্ণনাত্মক প্রবন্ধ। গল্পের মধ্যে দুটি রূপকথা ছিল, তবে তা বাংলাদেশের রূপকথা নয়। একটি পাঞ্জাব অঞ্চলের আর একটি ইউরোপের। দুটি গল্পই চমৎকারভাবে লেখা। বিদেশী মূল গল্পটিতে ভূত আছে। তবে সে ভূত আমাদের পেত্নীর পুরুষ নয় বিলিতি ভূত অর্থাৎ

শয়তানের অনুচর (Devil)। গল্পটির নাম 'ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভ'। যিনি গল্পটি ছেলেবেলায় পড়েছেন তিনি কখনই গল্পটিকে ভুলতে পারবেন না।

একটি ছোট বাস্তব গল্পে (নাম 'ভূতের গল্প') ভূত বলতে যে কিছু নেই তা দেখানো হয়েছে। সুতরাং যোগীন্দ্রনাথের বিবুদ্ধে শিক্ষাভিমানীদের কোনো অভিযোগ ছিল না।

মনে হয় 'ছবি ও গল্প' রচনাকালে যোগীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে 'বালক'-এ প্রকাশিত (এবং কড়ি ও কোমলে সংকলিত) চারটি ভালো কবিতা এতে আছে। এগুলি হল 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান', 'সাত ভাই চম্পা', 'মা লক্ষ্মী' ও 'হাসিরাশি'। গদ্য পদ্য সব লেখাই ছিল যথেষ্ট ছবি সংবলিত। কয়েকটি গল্পাত্মক সচিত্র ভালো কবিতা দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯০২-০৩?) থেকে পরিত্যক্ত হয়েছে। এগুলি যোগীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের কোনো সংকলনে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। কার লেখা কে জানে। একটির পরিচয় এখানে দিই। কবিতাটি ছোট নয়, কতকটা নাটকেব ধবনে। পৃথিবীর চারদিকে দেশের আবহাওয়া ও অবস্থার পরিচয়। অবশ্যই ইংরেজির অনুবাদ। কবিতাটির নাম 'পথিক'। আরম্ভ এই রকম :

> কতকগুলি বালক মণ্ডলাকারে বসিবে। অপর চারটি বালক পথিক সাজিয়া চারদিক হইতে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইবে। একজন পথিক আসিলে বালকেরা তাহাকে প্রশ্ন করিবে ও সে উত্তর দিবে।
>
> (প্রথম পথিকের আগমন)
>
> বালকগণ। কোথা থেকে আসছ তুমি ছোট্ট মানুষটি?
গল্প যদি বলতে পার বল ত একটি।
>
> ১ম পথিক। আসছি আমি সাদা সাদা ভাল্লুকের দেশ থেকে,
জল স্থল সদাই উজল বরফে আছে ঢেকে;
বিশাল দেহ তিমির সনে সিন্ধুঘোটক খেলে,
সারা জীবন ঠক্ ঠক্ ঠক্ কাঁপবে সেথা গেলে।
>
> বালকগণ। সারা জীবন ঠক্ ঠক্ ঠক্ কাঁপবে সেথা গেলে;
লাফিয়ে উঠে চড়ব মোরা হরিণ টানা গাড়ী
চক্‌মকে সে তুষার ঠেলে দিবে তারা পাড়ী।
>
> (দ্বিতীয় পথিকের আগমন)
>
> বালকগণ। কোথা থেকে আসছ তুমি ছোট্ট মানুষটি?
গল্প যদি বলতে পার বল ত একটি।

২য় পথিক। আসছি আমি সুদুর হতে তীব্র রবির করে,
মনের সুখে কাফ্‌রী, যথা ঘরকন্না করে,
কষ্টে অতি খনির সোনা তুলছে নরনারী,
মরুর পরে থপ্‌ থপ্‌ থপ্‌ যাচ্ছে উটের সারি।

বালকগণ। মরুর পরে থপ্‌ থপ্‌ থপ্‌ যাচ্ছে উটের সারি,
জলের তরে শুষ্ক পথিক ব্যস্ত অতিশয়,
দূরের থেকে টুং টুং টুং ঘণ্টাধ্বনি হয়।

(তৃতীয় পথিকের আগমন)

বালকগণ। কোথা থেকে আসছ তুমি ছোট্ট মানুষটি?
গল্প যদি বলতে পার, বল ত' একটি।

৩য় পথিক। আসছি আমি রবি যথা প্রথম দেখায় মুখ,
নধর নধর চা-গাছ দেখে সবার বাড়ে সুখ।
স্বাধীনভাবে দুরন্ত বাঘ জঙ্গলে বিচরে,
গুড়ুম গুড়ুম বন্দুকের রব হাতীর দাঁতের তরে।

বালকগণ। গুড়ুম গুড়ুম বন্দুকের রব হাতীর দাঁতের তরে,
অস্ত্রশস্ত্র লয়ে তথা শিকারীরা যায়,
মিছিমিছি বনের পশু মারে সমুদায়।

(চতুর্থ পথিকের আগমন)

বালকগণ। কোথা থেকে আস্‌ছ তুমি ছোট্ট মানুষটি?
গল্প যদি বলতে পার, বল ত একটি।

৪র্থ পথিক। আসছি আমি রবি যথা ডুবে সবার শেষে,
নদ-নদী প্রকাণ্ড হ্রদ আছে যেই দেশে
বড় বড় ঘাসের বনে বুনো মহিষ ধায়
অসভ্য লাল ইন্ডিয়ান আজো দেখা যায়।

বালকগণ। অসভ্য লাল ইন্ডিয়ান আজো দেখা যায়।
গায়েতে রং, মাথায় পালক লোমের জুতা পরে,
বড় বড় নদীতে যায় কাঠের ডিঙ্গী চড়ে।

৪র্থ পথিক। চালিয়ে ডিঙ্গি মনের সুখে, লাফিয়ে উঠে তীরে,
নাচে গায়, হাসে, খেলে, সবাই ঘুরে ফিরে।

সকলে একত্রে। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম, যা বল না ভাই,
দেশের মত এমন স্থান আর এ জগতে নাই।

আর একটি কবিতা আপনাদের শোনাচ্ছি। এটি ছেলেদের কাছে খুব মুখরোচক।

কবিতাটি দ্বিতীয় সংস্করণেও ছিল। পরে পরিত্যক্ত হয়েছে। কেন কে জানে। কবিতাটি এক পড়ুয়া ছেলের মুখের আর মনের দ্বন্দ্ব বর্ণিত হয়েছে। নাম 'সতীশের পড়া'।

মুখ বলে)। রাম নামে ছিল এক ছেলে
মন বলে)। হ্রে আমার লাট্টু দেছে ফেলে।
মুখ বলে)। পড়াশুনায় রামের সদা মন,
মন বলে)। লাট্টু ফেলা দেখাব কেমন!
মুখ বলে)। প্রত্যহ রাম বিদ্যালয়ে যায়।
মন বলে)। মাঞ্জা দিব ঘুড়ির সূতায়।
মুখ মলে)। গুরুর কথা শুনে এক মনে,
মন বলে)। খেলবো প্যাঁচ ননীলালের সনে,
মুখ বলে)। পরীক্ষায় সে পুরস্কার পায়,
মন বলে)। পারিনে আর বোনটার জ্বালায়।
মুখ বলে)। রামের সাথে সবারি ভাব আছে,
মন বলে)। দুষ্টুমিটা বল্লে বাবার কাছে।
মুখ বলে)। ক্লিষ্ট হাসি সদাই রামের মুখে,
মন বলে)। ওদের গাছে কুলগুলি টুকটুকে।
মুখ বলে)। যে দেখে তায়, অমনি ভালবাসে।
মন বলে)। পালিয়ে যাব ধরতে যদি আসে।
মুখ বলে)। রামের গায়ে সাদাসিদে সাজ,
মন বলে)। পড়াশুনা হ'ল নাক আজ!
মুখ বলে)। রামের মত হও শিশু সবে,
মন বলে)। গুরুকে আজ ফাঁকি দিতে হবে।
এইরূপে সতীশের পড়া সাঙ্গা হ'ল,
এমন সুন্দর পড়া কে দেখে বল?
যেমন মজার পড়া, উচিত তাহার,
শিক্ষকের কাছে হ'ল বেদম প্রহার!

'সতীশের পড়া' কি রবীন্দ্রনাথের রচনা?

বাংলা রূপকথার মূল্য আবিষ্কার করেছিলেন লালবিহারী দে। তাঁর আবিষ্কারের ফল সঙ্গো সঙ্গো পেয়েছিলেন ইংরেজি জানা স্বদেশী ও বিদেশীরা। তারপর দেশের মানুষের কাছে কিছুকাল পরে ধরা পড়েছিল এর মূল্য। সে কথা আগেও অন্যত্র বলেছি। আমাদের দেশে শিক্ষিত ব্যক্তিরা কিন্তু এ সব গল্পের ঐতিহাসিক মূল্যই স্বীকার করতেন বর্তমানের বাজারে এ বস্তুর জোগান পছন্দ করতেন না। এঁরা ছিলেন

"সত্যদ্রষ্টা" এবং "নীতিপরায়ণ"। তাই রাক্ষস-খোক্কস, দৈত্যদানব, ভূতপেত্নী, ব্রহ্মদত্যি, ডাইনি এ সব কাল্পনিক চরিত্রের কাহিনী তাঁরা শিশুপাঠ্য করতে চাইতেন না। তাঁরা ভাবতেন, এ সব গল্প পড়লে ছেলেরা ভিতু কাপুরুষ হয়ে পড়বে। তাঁদের এই ভুল ধারণা অনেকদিন শিক্ষিত বাঙালীর মন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এ ভুল রবীন্দ্রনাথ করেননি। তাঁর প্রতিভার কষ্টিপাথরেই এমন সব রূপকথার ন্যায্য মূল্য ধরা পড়েছিল। গল্পের রাক্ষস-খোক্কস ভূতপেত্নীর যে ভয় তা যে ছেলেদের এক রকম আনন্দই দেয় তার ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ 'শিশু'র কোনো কোনো কবিতায় করে গেছেন,

ভয় করতেই ভালোবাসি তোমার বুকে চেপে।

রূপকথার নায়ক রাজপুত্রকে তো রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক গদ্য পদ্য রচনায় চিরন্তন দিগ্‌বিজয়ী মানবাত্মার প্রতীক করে এঁকে গেছেন।

বাংলা মেয়েলি ছড়ার মধ্যে কী হীরের টুকরো লুকিয়ে আছে তা রবীন্দ্রনাথই প্রথম আবিষ্কার করলেন। ১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর "ছেলে ভুলোনো ছড়া" প্রবন্ধটি কলম্বাসের কীর্তির মতো ছড়াগুলির অজস্র পাঠভেদ লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন তা তাঁর লেখনীতেই সম্ভব। "এই কামচারিতা কামরূপাধারিতা ছড়াগুলির প্রকৃতিগত, ইহারা অতীত কীর্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সচল, ইহারা দেশকাল পাত্র বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে।"

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি ছড়া উদ্ধৃত করেছিলেন যার লিরিক মূল্য যে কোনো দেশের সাহিত্যে গর্ব করবার মতো। সেকালে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হত এবং তারপর বাপের বাড়ির সঙ্গে মেয়ের সম্পর্ক আসতে আসতে মিলিয়ে যেত। তাই মেয়েলি ছড়ায় বলে,

মেয়েছেলে কাদার ডেলা
ধপাস করে জলে ফেলা।

কাদার ডেলাকে জলে ফেললে অল্পক্ষণেই তার স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস হয়ে যায়।

এমনি একটি মেয়ের শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা চরমে উঠেছে। তাকে বাপের বাড়িও ডাকে না, শ্বশুরবাড়িও ছাড়ে না। নিরুপায় সে কামনা করছে নদী যেন বান ডেকে তাদের উঠোনে এসে পড়ে। তাহলে সে ঝাঁপ দিয়ে হাড়মাস জুড়োতে পারে।

হাড় হল ভাজা ভাজা মাস হল দড়ি,
আয়রে আয় নদীর জল ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।

ছেলে ভুলানো ছড়া সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথই পথ দেখিয়েছিলেন। সে কালে কেউ কেউ তাঁর অনুসরণ করেছিলেন। প্রথম সংগ্রহ করেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, তারপরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ সরকার। আশুতোষের বই 'ছেলে ভুলোনো ছড়া' আর

যোগীন্দ্রনাথের বই 'খুকুমণির পড়া' আগে পরে বেরিয়েছিল, তবে একই বছরে (১৩০৬)। আশুতোষের ভূমিকার তারিখ ২০ শে আশ্বিন ১৩০৬।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থে আড়াইশোটি ছড়া সঙ্কলিত আছে। এ বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের ঋণ স্বীকার করেছেন, তাঁর এক বন্ধুর সহায়তাও স্বীকার করেছেন। ভূমিকায় একটু ইঙ্গিত আছে যেন ছড়া সংগ্রহ কাজে সাহিত্য পরিষৎ থেকে সমুচিত উৎসাহ পাননি। একথা যদি সত্য হয় তবে তা তিনি রবীন্দ্রনাথের মুখেই শুনে থাকবেন।

উপযুক্ত অংশ উদ্ধৃত করছি।

> এক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিন পূর্বে বহু চেষ্টা ও শ্রম স্বীকার করিয়া এই সকল ছড়া সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় অনেকগুলি প্রকাশ করেন। কিন্তু বোধ হয় লোক গঞ্জনার ভয়ে ও প্রবীণদের তাড়নে তিনিও ইহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন, প্রবীণের বজ্রশাসনে মিলিত হইয়া আমরা এই রূপ অনেক জিনিস হইতে বঞ্চিত হইতেছি।

এ উক্তির ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্য পরিষৎ সম্পর্কে। আশুতোষবাবু নিশ্চয়ই তাঁর এই ভূমিকা রচনায় রবীন্দ্রনাথের সাহায্য পেয়েছিলেন।

শিশুলীলা—সেকালের সাহিত্যে

সব ভাষাতেই শিশুচেষ্টা লোকগাথার লোককথার বস্তু। যে ভাষায় কোনো রকম সাহিত্য নেই— যে ভাষা অক্ষর আশ্রয় করে শিল্প রচনা করতে পারেনি সেখানে তা লোকসাহিত্যের মূলবীজ যে মেয়েলি ছড়া কাকলি ও প্রবচন তাতেই আবদ্ধ। ভদ্র ও অনুশীলিত সাহিত্যে শিশুচেষ্টা দেখা দিয়েছে অনেক অনেককাল পরে। শিক্ষিত মানুষের কৌতূহল যখন দেবদেবী, স্বর্গ মর্ত্য, যক্ষরক্ষ, শূরবীর, অপ্সরী রাজকন্যা, রাজা-উজির, হস্তীরথ, অদ্ভুত-অলৌকিক ইত্যাদি বিষয়ে অনেকটা কমে এসেছে আর সাধারণ মানুষের ঘরোয়া জীবন ব্যাপারে ঔৎসুক্য জেগেছে তখন থেকে শিশু অপ্রয়োজনীয়ের কৌতূহল কেন্দ্রে প্রবেশ করবার সুযোগ পেয়েছে। সে সুযোগের সুবিধা অন্য দেশে, বাইরের সাহিত্যে যতটুকু আমার জানা আছে নিতান্ত আধুনিক কালেই ঘটেছে। কিন্তু আমাদের সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চে পুরো ভূমিকা নিয়ে শিশুর প্রবেশ আধুনিককালের অনেক আগেই ঘটেছিল এবং ছোটখাট ভূমিকায় শিশুর আনাগোনা গোড়া থেকেই ছিল।

ভারতবর্ষের সাহিত্য প্রথম থেকেই মার্জিত ও সমুন্নত। ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ঋগ্‌বেদ প্রধানত ধর্মঘটিত হলেও তা কবিতাকোষ। সে কবিতার ভাষা দীর্ঘকালের অনুশীলনের ফলে পরিমার্জিত সাহিত্যের ভাষা। সে কবিতার ছন্দও দীর্ঘকালের পরিশীলনের ফলে মসৃণ। ঋগ্‌বেদের কবিতা, ভাষায় ও ভাবে পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যের মূল উৎস। ভাষায় ঋগ্‌বেদের উৎস-সন্ধান সহজ, বিদেশী পণ্ডিতেরা তার পথ বেঁধে দিয়েছেন। ভাবে সে সন্ধান সহজ নয়। সে পথের চিহ্ন কেবল অধ্যবসায়ী বিশেষজ্ঞের নজরেই পড়তে পারে। হয়তো এ কথায় আপত্তি হবে। কিন্তু আমি ধর্মভাবের কথা তুলছি না। উপনিষদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত অনেক রাজপথ বেঁধে দেওয়া হয়েছে ঋগ্‌বেদের প্রস্রবণ গিরির পাদমূলে পৌঁছবার।

ঋগ্‌বেদের কবিতা যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা শিশুপ্রিয় বলব না, শিশুরুচি ছিলেন। তাই দেখতে পাই যে, ঋগ্‌বেদের কবিতায় উপমা-উৎপ্রেক্ষায় শিশুচেষ্টা ও শিশুলীলা ধর্মভাবের অর্থাৎ দেবস্তুতি কবিতাগুলিতেও ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। তার মানে হল, সেকালের লোকের মনের শিশুর প্রতি মত্ত্ববোধের অতিরিক্ত একটু যেন বিস্ময়বোধ ও আনন্দবোধের রং লেগেছিল। 'শিশু' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ (—লুপ্ত, প্রাচীন 'শূ' ধাতু থেকে, মানে বেড়ে ওঠা; শিশু মানে যে বাড়ছে, অর্থাৎ বাড়ন্ত প্রাণ—) তখনও ধুয়ে মুছে যায়নি। তাই বাড়ন্ত মানব প্রাণের প্রতি সস্নেহ বিস্ময় সেকালের সংবেদনশীল মনের আনন্দে বিস্ময়ের বিষয় ছিল। তাই ঋগ্‌বেদের নিতান্ত আনুষ্ঠানিক সূক্তেও মাঝে

মাঝে দেখা যায় যে শিশুর অনপেক্ষিত ছবি ফুটে উঠেছে— মায়ের কোলে ধাইয়ের কাছে আনন্দে ক্রীড়ারত শিশুর ছবি। যেমন, মরুদ্‌গণের তুলনা করা হয়েছে যেন সব ছোট শিশু খেলা করছে মায়ের গোচরে ("শিশূলা ন ক্রীড়য়ঃ সুমাতরঃ")। সূর্য-চন্দ্রকে বলা হয়েছে যেন দুটি শিশু গগনাঙ্গানে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে খেলছে ("পূর্বাপরং চরতো মায়অয়তৌ শিশূ ক্রীড়ন্তৌ পরিমাতো অধ্বরম")। সোম ছেঁচার নুড়ি বৈদিক কবির দৃষ্টিতে বোধ হয়েছে যেন খেলায় রত শিশুরা মাকে ঠেলা দিচ্ছে আর ডাক পাড়ছে ("সূতে অধ্বরে অধিবাচম্ অক্রত আক্রীড়য়ো ন মাতরং তুদন্তঃ")। দরদরধারায় নিষ্কাষিত সোম পাত্রে পড়েছে দেখে কবির মনে হয়েছে যেন এক উচ্ছল শিশু মা-মাসি-পিসির কোলে নিজের মনে বকে চলেছে ("সম্ মাতৃভির্ ন শিশুর বাবশানঃ")।

ঋগ্‌বেদের কালে গৃহস্থ পরিবারে ইউনিট ছিল যেন পিতামাতা ও শিশু এই তিন নিয়ে। পিতা ছিল ঘরের কর্তা ("পতির্ দন্" বা "দম্পতিঃ), পিতামাতা দুজনে মিলে ছিল ঘবের কর্তা-গিন্নী ("দম্পতী") শিশু ছিল, গার্হপত্য অগ্নির মতো, ঘরের আলো ঘরের ছেলে ("শিশুর্ দন্")।

শিশুর চরিত্রের পর্যবেক্ষণে বৈদিক কবির সূক্ষ্ম দৃষ্টির খুব ভালো একটা পরিচয় পাই ঋগ্‌বেদের একটি বিখ্যাত লৌকিক অর্থাৎ অ-ধর্মঘটিত সূক্তে, "জুয়াড়ির খেদ" কবিতায়। জুয়ায় বার বার হেরে গিয়ে জুয়াড়ি সর্বস্বান্ত হয়েছে, তার সংসার তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সমাজ তাকে আমল দেয় না। সে ভাবছে জুয়ার চরিত্র। জুয়ার ঘুঁটির চাল তার কাছে ঠেকছে যেন ছোট ছেলের খামখেয়াল। শিশুর কাছে হাত পেতে কিছু চাইলে সে তা দিতে পারে, কিন্তু দেয় যদি তবে সে হেসে তখনি তা ফিরে নেবে। জুয়ার দানও তাই। জুয়ার ঘুঁটিরা যেন শিশুর মতো দাতা, যাকে যদি দেয় তবে তার কাছ থেকে তখুনি কেড়ে নেয় ("কুমারদেষ্ণা জয়তঃ পুনর্হণঃ মধ্বা সম্পৃক্তাঃ")। আর একটি লৌকিক সূক্তে, "ব্যাঙের কবিতায়", বর্ষার আবির্ভাবে প্রথম বৃষ্টির পশলা পেয়ে ব্যাঙের কোলাহল তুলিত হয়েছে, দীর্ঘপ্রবাসী পিতার গৃহে প্রত্যাগমনে শিশুপুত্রের স্বাগত হর্ষ-কলধ্বনির সঙ্গো ("অখ্‌খলীকৃত্য পিতরং ন পুত্রঃ")।

সন্তান বাৎসল্যের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে ঋগ্‌বেদের একমাত্র প্রেমের কবিতাটিতে, উর্বশী-পুরুরবার নাটকীয় সূক্তে। উর্বশী পুরুরবাকে চিরদিনের জন্যে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। সে তখন সন্তানসম্ভবা। তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে পুরুরবা তার পিছু পিছু দৌড়তে দৌড়তে কাতর প্রার্থনা করছে নানা যুক্তি দিয়ে। তার শেষ আবেদন হল গর্ভস্থ শিশুর পক্ষ নিয়ে। পুরুবরা বললে, ছেলে একটু বড় হয়ে যখন বাপকে দেখবার জন্যে আবদার করবে তখন তো বাপ নেই জানতে পেরে তার চোখের জল ঝরবে। তুমি কী করে তা ঠেকাবে? ("কদা সূনুঃ পিতরং জাত ইচ্ছাথ চক্রন্ ন অশ্রু বর্তয়দ্ বিজানন্।")

উপজায়মান আশ্চর্য কিছু গোড়াকার বৈদিক কবিদের কল্পনাকে সহজেই উত্তেজিত

করত। বিভিন্ন ঋতুতে উষার আবির্ভাব ও প্রতিদিন সূর্যের উদয় (তখন প্রাতঃসূর্যের বিশেষ নাম ছিল সবিতা) বৈদিক কবির কবিতার প্রেরণা জোগাত একথা আমরা জানি। শিশুর দেহে উপচীয়মান মানব প্রাণও তেমনি যে তখনকার কবির চিত্তকে নাড়া দিয়েছিল সে কথা আমাদের কাছে স্পষ্ট না হলেও অস্বীকার করা যায় না। উষা ও সবিতা নিয়ে অনেক সূক্ত রচনা হয়েছিল, শিশু নিয়ে হয়েছিল কি না জানি না, হয়ে থাকলে বিলুপ্ত। ঋগ্‌বেদে একটিও শিশু-সূক্ত নেই। (থাকবার কথাও নয়, ঋগ্‌বেদের কবিতায় দেবতারই জয়গান।) তবে ঋগ্‌বেদের কবিতা মন দিয়ে পড়লে এটা ধরা পরে যে শিশুলীলা সেকালের কবির চিত্ত কতটা অধিকার করেছিল। তা না হলে ঋগ্‌বেদের কবিতায় শিশু প্রতীকের অত ছড়াছড়ি কেন। ঋগ্‌বেদের কবির কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা ছিল দুটি (—যদিও তাঁরা খাঁটি আধিদৈবিক দেবতা হননি, আধিভৌতিক দেবতাই রয়ে গিয়েছিলেন), অগ্নি আর সোম। বৈদিক কবির কল্পনায় অগ্নি ও সোম দুইই শিশু— মৌলিক অর্থে, উপচীয়মান আশ্চর্যসত্তা, তবে দৈব শিশু। দিব্য মূর্তিতে অর্থাৎ আকাশে বিদ্যুৎরূপে, অগ্নি যথার্থ দৈব শিশু। তাঁর পিতা হলেন গগন ("দৌঃ") মাতা হলেন পৃথিবী। পার্থিব মূর্তিতে অর্থাৎ পৃথিবীতে, মাটির ঘরে, অগ্নি, ভৌম শিশু, তাঁর পিতামাতা হল অরণিদ্বয় (যার ঘর্ষণে ব্যবহার্য অগ্নির উৎপত্তি)। ভৌম অগ্নির জন্ম মানুষের মতোই তবে এ শিশু মাবাবাখোর, জন্মেই সে তার বাপমাকে খেয়ে ফেলে ("জায়মানো মাতরা গর্ভোগত্তি")। মাতাপিতৃহীন সে শিশুর পোষণের ভার গৃহস্থের উপর।

বৈদিক কবিকল্পনায় সোম যেন সাত-বোন সতিন মায়ের সদ্যোজাত আদরের চতুর শিশু ("সপ্ত স্বসারো অভি মাতরঃ শিশুং নবং জজানং জেন্যং বিপশ্চিতম্")। মনে হয় এই কল্পনাটির উৎস কোনো মেয়েলি গল্প। পরবর্তী কালে এমনি গল্পকথা অবলম্বনেই যাণ্মাতুর কার্তিকেয়ের কাহিনী গড়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের ছেলে ভুলানো কথা কোষের সাত বোন সতিনের এক ছেলের গল্প এই প্রসঙ্গো মনে পড়ে।

ঋগ্‌বেদের পরে বৈদিক সাহিত্য যে পথে চলেছিল তা সাহিত্যের প্রশস্ত রাজপথ নয়, কবিকল্পনার অভিসার- সরণিও নয়। সে হল ধর্ম-অনুষ্ঠানের বর্ণনার ও ব্যাখ্যার বাঁধানো অন্ধ গলি, তার পাশে পাশে তত্ত্বকথার গোলোক ধাঁধার পায়ে চলা পথ। ঋগ্‌বেদের পর থেকেই ভারতীয় সিদ্ধ সাহিত্য এই যে বাঁক নিলে তাতে পরলোকের চিন্তাই যেন পথের শেষ ও একমাত্র গন্তব্য স্থান হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং যে সাহিত্যে কবিকল্পনার ঠাঁই ছিল না, থাকলেও খুব সামান্যই ছিল এরকম সাহিত্যের লেখকদের মনকে প্রকৃতি— সজীব ও নির্জীব— একটুও নাড়া দিতে পারেনি। তাঁরা প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করেন নি বটে, কিন্তু প্রকৃতির প্রতি তাঁরা মনোযোগ দেননি। তাঁরা প্রকৃতি ও শিশুকে ভিন্নভাবে ও সজীববৎ দেখেননি। তাই তাঁদের রচনায় মানব শিশুর দেখা ক্বচিৎ মেলে।

বৈদিকের পরে সংস্কৃত সাহিত্যে পৌঁছে দেখি যে সে সাহিত্য তিন ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। এক হল ধর্মের ও দর্শনের অর্থাৎ অধ্যাত্মচিন্তার ধারা, দুই হল কালবাহিত ইতিহাস পুরাণের অর্থাৎ জনশ্রুতির ধারা, তিন হল কবিকর্মের অর্থাৎ নূতন নূতন রচনার ধারা। প্রথম ধারা ঠিক সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না, সুতরাং আমাদের আলোচনা থেকে বাদ গেল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারা আমাদের এখন আলোচ্য। বলে রাখি এই দুই ধারার এমন কোনো গ্রন্থ বা নির্দিষ্ট রচনা আমরা পাইনি যার রচনাকাল সুনিশ্চিতভাবে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর আগে ফেলা যায়।

দ্বিতীয় ধারা বৈদিক সাহিত্য থেকে, ঠিক করে বলতে গেলে বৈদিক কাল থেকে, উৎসারিত। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে আমরা যেভাবে "ইতিহাস-পুরাণ"-এর পরিচয় পাচ্ছি তার থেকে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায় যে এ ধারার অনুশীলন দীর্ঘকাল ধরে চলে এসেছিল। কিন্তু সে দীর্ঘ অনুশীলনকালের রচনার কোনো নিদর্শন আমরা পাইনি, তবে সে রচনার বস্তু কিছু কিছু পেয়েছি এবং সেই বস্তুর সঙ্গে বিজড়িত রচনার খণ্ডাংশও হয়তো কিছু কিছু পেয়েছি। সে যাই হোক দ্বিতীয় ধারা নিয়ে আমাদের আলোচনা আমাদের হস্তগত ইতিহাস-পুরাণের উপর নির্ভর করেই করতে হয়। এ সব গ্রন্থে দেখি যে শিশুর দৈবী মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। সে কথা একটু পরে বলছি।

বেদের অবসানকাল আর খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী, এর মধ্যে লোকসাহিত্য বেশ সজীব ও সক্রিয় ছিল। তার প্রমাণ কিছু কিছু কোনো কোনো বৈদিক গদ্য গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। এর বাইরে লোক কবিতার ইঙ্গিত কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়। (অন্তত আমার বিবেচনায়) পাণিনির একটি সূত্রে। সে সূত্রে তিনি কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামের ব্যুৎপত্তি দিয়েছেন। এই সূত্র থেকে জানা যায় যে, তাঁর সময়ে 'শিশুক্রন্দীয়' নামে গ্রন্থ (বা রচনা) প্রসিদ্ধ ছিল। নামটি থেকে বোধ হচ্ছে রচনাটি ছেলে-ভুলানো ছড়ার সংগ্রহ বা সেই মতো কিছু "শিশুসাহিত্য"। (তবে "শিশুক্রন্দ" যদি কোন ব্যক্তিনাম হয় তবে আমার এই অনুমান খাটবে না। তখন মানে হবে শিশুক্রন্দনের আখ্যায়িকা।)

দ্বিতীয় ধারাব সাহিত্যও ধর্মাশ্রিত তবে এখানে ধর্মচিন্তা অর্থাৎ অধ্যাত্ম-রস প্রধান নয়, প্রধান হল নীতিকথার রং চড়ানো গল্পরস। ইতিহাস-পুরাণ ধর্ম-অনুষ্ঠানের কাজে প্রত্যক্ষভাবে লাগত না। ধর্ম-অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিকরূপে জনসাধারণের মনোরঞ্জন এবং সেই সঙ্গে নীতি ও ধর্ম উপদেশ দেওয়াই ইতিহাস-পুরাণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। লোকে যেসব প্রাচীন আখ্যান আগ্রহ করে শুনত সেই সবই নতুন উপাদান মিশিয়ে নতুন ছাঁচে ঢেলে নতুন নতুন রঙ লাগিয়ে অর্থাৎ ভিন্ন দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণনায় নিয়োগ করে অথবা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মচিন্তার উপযোগী করে ইতিহাসে (অর্থাৎ মহাভারতে) এবং বিভিন্ন পুরাণে কালে কালে বর্ণিত হয়ে এসেছে। ঋগ্‌বেদে ইন্দ্রই প্রধান দেবতা, কিন্তু ঋগ্‌বেদের পরে বৈদিক সাহিত্যে ইন্দ্রের প্রাধান্য অস্বীকৃত না হলেও ধর্মচিন্তায় এবং ধর্ম-অনুষ্ঠানে ইন্দ্রের উপরে বিষ্ণুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,

এমনকী বিষ্ণু প্রায় একমাত্র (—কতক পরিমাণে রুদ্র ছাড়া—) দেবতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ঋগ্‌বেদে বিষ্ণু শিশু নন যুবা, তাঁর পত্নীরও ("বিষ্ণুপত্নী") একবার উল্লেখ আছে। ঋগ্‌বেদে বিষ্ণু ইন্দ্রের এক প্রধান সহায়, ছোট ভাইয়ের মতো। তাই পরে ইতিহাস-পুরাণে বিষ্ণুর নামান্তর পাই "উপেন্দ্র" "ইন্দ্রাবরজ"। মহীয়ান বড় ভাইয়ের তুলনায় ছোট ভাইয়ের মাহাত্ম্য যখন অত্যন্ত বেড়ে গেল তখন দু ভাইয়ের বৈপরীত্য স্পষ্টতর রূপ নিলে বিষ্ণুর খর্বকায়ত্বে তাঁর শিশুত্বে। তবে এই ভাবনার নীচে ছিল যজ্ঞশিশু অগ্নির সঙ্গো বিষ্ণুর অভিন্ন বোধ। বেদের কর্মকাণ্ডের গ্রন্থগুলি যখন রচিত অথবা সংকলিত হচ্ছিল তখনই বিষ্ণু যজ্ঞের অর্থাৎ যজ্ঞাগ্নির প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। যজ্ঞশিশু বিষ্ণুকে নিয়ে একাধিক রূপক গল্প বৈদিক গদ্য গ্রন্থগুলিতে আছে। ইতিহাস-পুরাণে এই সব গল্প ইনিয়ে বিনিয়ে ও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বড় বড় আখ্যায়িকায় রূপ দেওয়া হয়েছে। সে সব গল্প আমরা জানি। শুধু একটা বৈদিক রূপক গল্প এখানে বলছি।

দেবতা ও অসুর ছিল ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি, বৈমাত্র ভাইয়ের মতো। তবে অসুরেরা ছিল বড়, বয়সে শক্তিতে বুদ্ধিবিদ্যায়। কুরুপাণ্ডবের মতো প্রথমে তারা যেন এক বড় পরিবারের অন্তর্গত ছিল। ছোট তরফ নাবালক দেবতাদের অভিভাবক হিসাবে অসুররাই যৌথ সম্পত্তির দেখাশোনা করত। তারা মনে করত গোটা পৃথিবী তাদেরই সম্পত্তি। একদিন দেবতাদের হঠাৎ কানে গেল, অসুরেরা নাকি পৃথিবী নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে নিচ্ছে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে একেবারে বঞ্চিত হবার আশংকায় দেবতারা তখনি চলে গেল অসুরদের কাছে। গিয়ে সম্পত্তির ন্যায্য ভাগ চাইলে। অসুরেরা তাদের দাবি উড়িয়ে দিলে। তখন তারা, পাণ্ডবেরা যেমন, কুরুদের কাছে শুধু খাওয়া পরার জন্যে পাঁচখানি গ্রাম চেয়েছিল তেমনি, যজ্ঞের জন্যে যৎকিঞ্চিৎ ভূমি চাইলে (—অপরের ভূমিতে যজ্ঞ হয় না—), অতি সামান্য এতটুকু স্থান। তাঁরা বিষ্ণুকে দেখিয়ে বললে, এর মাটিতে শুতে যতটুকু স্থান ততটুকু দিলেই চলবে। বিষ্ণু শিশুবৎ, খর্বকায়। তাকে দেখে অসুরেরা এ প্রস্তাবে আপত্তি করলে না। সেই হল তাদের কাল। বিষ্ণু শুয়ে পড়ে চারিদিকে হু হু করে বাড়তে লাগলেন, অসুরেরা হটতে লাগল। হটতে হটতে অবশেষে তাদের পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হল।

বিষ্ণু একরূপে শিশু যজ্ঞাগ্নি ("আবূহবনীয়") আর একরূপে শিশু গৃহাগ্নি ("গার্হপত্য")। গৃহে অগ্নিশিশুরূপে বিষ্ণুর প্রতীকত্ব শিশু কৃষ্ণের গাথার মধ্যে তলিয়ে গেছে। কৃষ্ণ কথার উদ্ভব হয়তো মধ্য বৈদিককালেই ঘটেছিল। তবে অনেকদিন ধরে তা মেয়েলি গাথার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। বৈদিক সাহিত্যের অবসানের পরেই মনে হয় কৃষ্ণ কথার সঙ্গো বিষ্ণু কথা মিলে গিয়ে কৃষ্ণ-বিষ্ণুর সমাহার প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই সমাহারের গোড়া থেকেই কৃষ্ণভাগই প্রাধান্য পেয়েছে। পরে বিষ্ণু কৃষ্ণের থেকে স্বতন্ত্র হয়েছেন খোলসের মতো এবং স্বভাবতই বিষ্ণু কৃষ্ণের অনেক তলায় নেমে গেছেন। সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।

বিষ্ণুকৃষ্ণ প্রতীক ও আখ্যানের বাইরেও কোনো কোনো পৌরাণিক আখ্যায়িকার

মধ্যে জগৎস্রষ্টা ও জগন্ময় ঈশ্বর-শিশুর বিশেষ একটি কল্পনা আছে। সে কল্পনার মূলে আছে একটি গল্পসূত্র, প্রতীকও বলা যায়। প্রলয় হলে বিশ্বজগৎ কারণার্ণবে মিশে যায়। যখন নূতন সৃষ্টির উপক্রম হয়, তখন কারণার্ণবশায়ী ঈশ্বর কারণার্ণবের উপরে ভেসে ওঠেন। তিনি সদ্যোজাত শিশুরূপে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষতে চুষতে বটপত্রের উপর ভাসতে থাকেন। এই কল্পনার বীজের সন্ধান মেলে বৈদিক কবিতায়, হিরণ্যগর্ভ সূক্তে। হিরণ্যগর্ভ (স্বর্ণকান্তি ডিমের কুসুম অথবা সদ্যোজাত শিশু) সৃষ্টির আদি ("সমবর্ততাগ্রে") তিনিই জগতের পতি ("ভূতস্য জাতঃ পরিরেক আসীৎ") এবং তিনিই বিশ্ববিধাতা ("স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং")। তিনি অগ্নি, তাঁকে গর্ভরূপে ধারণ করেছিল কারাণার্ণব ("আপো যদ্ বৃহতীর্বিশ্বমায়ন্ গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিম্")। তিনিই যজ্ঞ ("যশ্চিদাপো মহিনা পর্যপশ্যদ্ দক্ষং জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্")। তিনি দেবতাদের উপর দেবতা হলেন ("যো দেবেষ্বধি দেব এক আসীৎ")। হিরণ্যগর্ভ-কল্পনার সঙ্গো ব্রহ্মাণ্ড-কল্পনা জড়িয়ে আছে। হিরণ্যগর্ভ যেন ব্রহ্ম-অণ্ডের কুসুম। ডিম ভেঙ্গো হিরণ্যগর্ভ বেরিয়ে এলেন; ডিমের খোলা দুটি হল "দ্যাবা পৃথিবী", আকাশ আর মাটি। ডিম ভাঙা জলে বিশ্ব ব্যাপ্ত হল। সে জলে হিরণ্যগর্ভ ভাসতে লাগলেন। সংস্কৃত পুরাণের গল্পে ইনি শিশু হয়ে বটপত্রে ভাসছেন। আর দেশি পুরাণের গল্পে, ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে, তাঁকে দেখি হিরণ্যগর্ভের পরবর্তী অবস্থায়; আকাশে পূর্ণ উদিত সূর্যের রূপে উলুক-গরুড়ের পিঠে চড়ে অক্লান্ত পরিভ্রমণ করতে।

কৃষ্ণবিষ্ণু অভিন্ন বলে গৃহীত হবার ফলে ভারতীয় ধর্মচিন্তায় শিশু ঈশ্বরের কল্পনা দৃঢ়মূল হল। গোড়ার দিকে শিশুকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তিমত্তার গল্পগুলিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তার কিছু কিছু সাহিত্যে কীর্তিত এবং অল্প কিছু শিল্পে উৎকীর্ণ হয়েছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির রঙ্গামঞ্চে বীর শিশুরূপে এই হল কৃষ্ণবিষ্ণুর প্রথম অবতরণ। (এখানে ভগবদ্গীতার কৃষ্ণের কথা অনেকের মনে উঠতে পারে। গীতায় কৃষ্ণ বীর শিশু নন্, বিচক্ষণ জ্ঞানী। গীতায় আমরা উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞ গুরু দেবকীপুত্রকেই ভিন্ন বেশে দেখছি। ভগবদ্গীতাতে কৃষ্ণের বিষ্ণু প্রাপ্তির একটা সোপান লক্ষ্য করি। মানব অর্জুনের কাছে কৃষ্ণ প্রতিপাদন করছেন যে তিনিই সর্বেশ্বর।)

শিশু ঈশ্বরের দ্বিতীয় আবির্ভাব গোপশিশুরূপে। বিষ্ণুর সঙ্গো গোপালনের ঘনিষ্ঠ যোগ ঋগ্বেদেই স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। সুতরাং গোপ-শিশুকৃষ্ণের কাহিনী বীর-শিশু কৃষ্ণের কাহিনীর সমকালীন তো বটেই, এমনকী পূর্ববর্তী (অন্যসূত্রে আসা) হতেও পারে। তবে গোপশিশু কৃষ্ণের গাথা লোককথা থেকে পুরাণ-কথায় উন্নীত হতে একটু হয়ত বিলম্ব হয়েছিল। গোড়ার দিকে পুরাণ-কথায় যে গোপাল কৃষ্ণের কীর্তি গীত হয়েছে তিনি শিশু নন, কিশোর—তরুণ যুবকও বলা চলে। তাই ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম দিকে গোপবেষ কৃষ্ণবিষ্ণু দুগ্ধপোষ্য শিশুরূপে দেখা দেননি। তাঁকে নিয়ে গোপীবিলাসের গাথা তখন নিশ্চয়ই অজানা ছিল না কিন্তু সে গাথা ছিল একেবারে মেয়েলি সম্পত্তি, ভদ্রসাহিত্যে স্থান পাবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তাই কালিদাস গোপবেষ বিষ্ণুর নাম করেছেন, বৃন্দাবনের রমণীয়তার উল্লেখ করতে ভোলেননি।

কিন্তু গোপীবিলাসের ইঙ্গিতমাত্র তো নেইই, বৃন্দাবনের সম্পর্কে কৃষ্ণের উল্লেখও নেই।

বৈষ্ণব উপাসনায় কৃষ্ণবিষ্ণুর বালগোপাল মূর্তিটিই সবার আগে উপাস্যরূপে গৃহীত হয়েছিল এবং সেই বালগোপালের উপাসনা আশ্রয় করেই বাৎসল্য ভক্তিরস ভারতীয় ধর্মচিন্তায় নূতন সমৃদ্ধির সূচনা করেছিল। এ ব্যাপারের সূত্রপাত ঘটেছিল দক্ষিণ ভারতে এবং সম্ভবত খ্রীস্টীয় প্রথম সহস্রাব্দীর শেষ অংশে। খ্রীস্ট ধর্মের ঢেউ ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে প্রথমে এসে পৌঁছেছিল এবং সেখানে তা স্থানও পেয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো অল্পবিস্তর বিবিক্ত অঞ্চলের খ্রীস্ট ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম অনেককাল ধরে সহাবস্থান করে এসেছিল। তার ফলে দুটি ধর্মের মধ্যে কিছু দেওয়া নেওয়া হয়েছিল বলে মনে করতে পারি। নেওয়ার দিক থেকে আমাদের অর্থাৎ ভারতীয়দের অধ্যাত্মচিন্তায় কখনো কোনো বাধা ছিল না ও নেই, কিন্তু অন্য ধর্মে বাইরে থেকে কিছু গ্রহণের পথ বন্ধ। সুতরাং ভারতে খ্রীস্ট ধর্ম হয়তো প্রভাবিত হয়নি। কিন্তু খ্রীস্ট ধর্মের প্রভাব ভারতীয় ধর্মে পড়া অপ্রত্যাশিত নয়। একদা ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় শিশু কৃষ্ণের উপাসনায় খ্রীস্ট ধর্মের প্রভাব অনুমান করেছিলেন। এ কথা তিনি যখন বলেন তখন দেশাত্মবোধের মধ্যদিন। সুতরাং ব্রজেন্দ্রনাথের মন্তব্য আমাদের ভালো লাগেনি, আমরা তা গ্রাহ্যও করিনি। এখন কিন্তু তাঁর কথাটা ভেবে দেখতে হয়। এখন ভারতবর্ষের ইতিহাসকে রাষ্ট্রনেতারা নতুন করে লেখাবার ইচ্ছা করছেন এবং অনুগত পণ্ডিতেরাও লিখে ফেলতে প্রস্তুত রয়েছেন। আশঙ্কা করি—এ হিন্দু ধর্মের উপর খ্রীস্টীয় ধর্মের প্রভাব পড়েছে কি না সে আলোচনায় তাঁরা এগোবেন না। আমি ঐতিহাসিক নই, ঐতিহাসিকের বিচারে গ্রহণযোগ্য কোনো দলিলপত্র আমার কাছে নেই। শুধু আমার যা মনে হয়েছে তা নিবেদন করলুম। একদিকে রূপকথা আর একদিকে মেয়েলি অশ্লীলতা, এই দুটি খোলস ছেড়ে কৃষ্ণ যশোদার কোলে যে চোখ মেললেন তাতে মানুষের জীবনমূলের রস, বাড়ন্ত প্রাণের প্রতি প্রীতিরস, বিশুদ্ধ ভক্তিরস রূপে প্রথম দেখা দিলে ভারতীয় অধ্যাত্মচিন্তায়। ঠিক এই ব্যাপারই ঘটেছিল একদা ইউরোপে খ্রীস্ট ধর্মের প্রভাবে। মেরি-যীশুর সঙ্গে যশোদা-কৃষ্ণের তুলনা এখানে সহজেই মনে জাগে। রোমান ক্যাথলিকরা যে তাঁদের বাৎসল্য ভক্তিরস ভারতবর্ষ থেকেই পেয়েছিলেন তা মনে করলে হয়তো অহেতুক অনুমান হবে। যেখানে দীর্ঘকাল ধরে খ্রীস্ট ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সহাবস্থান করেছিল সেই দক্ষিণ ভারতেই বৈষ্ণব বাৎসল্য ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল এবং সেইখান থেকেই তা উত্তর ভারতে প্রসারিত হয়েছিল, একথা ঐতিহাসিক সত্য। সুতরাং খ্রীস্টীয় ধর্মের বাৎসল্য ভক্তির উত্তাপে যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে শিশুকৃষ্ণকে উপলক্ষ করে বাৎসল্য রস অপূর্ব ভক্তিরসে গাঢ়তা পাবে তা অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক মনে হয় না।

বাৎসল্যরস-উদ্দীপিত বৈষ্ণব ধর্ম ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্যে চিন্তায় নূতন ও মহৎ প্রেরণা জাগিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও হাসিখুসি

পাঠকের মধ্যে যাঁরা ছেলেবেলায় হাসিখুসি পড়েছিলেন অথবা ছেলে-মেয়েদের পড়িয়েছিলেন তাঁদের কাছে হাসিখুসি প্রথমভাগের প্রশংসা করা নিতান্ত অনাবশ্যক। বইখানি বেরিয়েছিল ১৮৯৭ সালে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষাসম্পৃটিত আনন্দের সোপানে বইটির জুড়ি নেই বাংলা ভাষায়। সমালোচক বলবেন, কেন বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ। বিদ্যাসগারের বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ নিশ্চয়ই অনেক বেশি সমাদৃত প্রথম পাঠ্য বই, আর সে বইটির অ-কালবারিত উপযোগিতা সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। (এমনকী পশ্চিমবঙ্গীয় গভর্নমেন্টের শিক্ষাবিভাগের পরশুরামের কুঠারও বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগকে ছুঁতে সাহস করছে না)। তবে কথা হল এই যে বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগের সর্বস্বীকৃত উপযোগিতা হল চণ্ডীমণ্ডপের পাঠশালায় (একদা ও নার্সারি রুমে—অধুনা), হাসিখুসি প্রথমভাগের আসর জমে শোবার ঘরে খাটে বসে কিংবা মাটিতে শতরঞ্জি মাদুর পেতে। (বলতে যাচ্ছিলুম মা দিদিমার পাতা আঁচলে বসে। কিন্তু সেদিন আর নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাড়া আর কোথাও মায়ের আঁচল পাতা দৃশ্য মিলবে না)।

আমার জীবনের একটি বিশেষ সৌভাগ্য মনে করি আমি খুব শৈশবে বড়োমার কাছে হাসিখুসি নিয়ে বর্ণপরিচয় আরম্ভ করেছিলুম। এ বইটির সাহায্যে বর্ণপরিচয়-সংগ্রামে কতটা জয়লাভ করেছিলুম মনে নেই। এইটুকুও মনে আছে—খুব গভীর ভাবে যে হাসিখুসির ছড়াগুলি আমাকে আড়াই তিন বছর বয়সেই মাতিয়ে তুলেছিল। স্বীকার করতে এখন লজ্জা হচ্ছে যে অত্যন্ত ভালো লেগেছিল একটি ছবি ও তার টীকা স্বরূপ (illustration) ছড়াটি। এক পাতার বড়ো ছবি। গুরুমশাই ছেলেকে গাধার টুপি পরিয়ে বেত মারছেন পাঠশালায় পড়া করেনি বলে। ছড়াটি অত্যন্ত চমৎকার। প্রথম দুটি কলি এই—

চ্যাপ্টা নাকে চশমা আঁটা
গুরু মহাশয়,
কানে কলম হাতে ছড়ি
দেখে লাগে ভয়।

শেষের দু কলি,

এক গুরুতে জগৎ মাত,
কাঁপে পড়োর দল,
মুখে শুধু কেঁউ কেঁউ
চোখে শুধু জল॥

ছবি ও ছড়া পরে হাসিখুসি থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে। বোধহয় তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের নির্দেশে। ভালোই হয়েছে।[১]

দুই

এতক্ষণ ভূমিকা রচনা করলুম। এইবার বক্তব্যে আসি। আমি এই প্রবন্ধে যা বলতে চাই তার কোনো প্রমাণপত্র বা সাক্ষীসাবুদ দিতে পারব না। আমি আমার অনুমানের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেছি। আমার অনুমানে কতটা প্রমাণের দৃঢ়তা বর্তমান তা সহৃদয় পাঠকের বিবেচ্য। কেউ কেউ দুঃখ পাবেন, তবুও এখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজকে 'কোট' না করে থাকতে পারছি না।

অভক্ত উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ,
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ।

রবীন্দ্রভক্তি এখন মোটেই ফেসনেব্‌ল নয়। আমি ফেশানের বাজ মাড়াই না।

(এখানে অভক্ত উষ্ট্রের ব্যাখ্যা করতে হয়, তা না হলে আমার পক্ষ বিপক্ষ কোনো দলই সমঝাতে পারবেন না। ব্যাখ্যাই দিই কৃষ্ণদাসের এক সমসাময়িক কবির লেখা থেকে।

যার যেই অভিলাষ সেই তাকে ভায়ে
পল্লব ছাড়িয়া উষ্ট্র কণ্টক চিবায়ে।

প্রাচীন কবির লেখা তুলে দিলুম। নইলে উষ্ট্রের উদাহরণ টানতুম না। এখন উষ্ট্রের খুব কদর। তৈল সাম্রাজ্যের প্রতীক জীব)।

আমার অনুমান ও বক্তব্য হাসিখুসি (১ম ভাগ) রচনায় রবীন্দ্রনাথের যেন হাত ছিল বেশ খানিকটা। এই অনুমান সোপানের তলায় পৌঁঠে হল—রচনাকালে (বইটি ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল) লেখক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গো (১৮৬৬-১৯৩৯?) রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ তার আগেই ঘটেছিল। কিন্তু কখন?

যোগীন্দ্রনাথের প্রথম ছেলেদের বই 'হাসি ও খেলা' বেরিয়েছিল ১২৯৯ সালে অর্থাৎ ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে। তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গো লেখকের বিশেষ যোগাযোগ ছিল বলে মনে হয় না। 'সাধনা' পত্রিকায় (১৩০১ সালের মাঘ সংখ্যায়) রবীন্দ্রনাথ বইটির যে সমালোচনা করেছিলেন তার থেকে আমি এই অনুমান করছি। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা থেকে উপযুক্ত অংশ উদ্ধৃত করে দিই।

"বইখানি যেমন ভাল বাঁধাই তেমনি ভাল করিয়া ছাপানো এবং ছবিতে পরিপূর্ণ। নিঃসন্দেহে বইখানি অনেক ব্যয়সাধ্য হইয়াছে.....

১ এইটুকু আমি স্মরণম্ অবলম্বনে লিখলুম। হয়তো ছড়াটি গোড়া থেকেই হাসিরাশি বইটিতেই ি।

"এই গ্রন্থে যে রচনাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা শিশু পাঠ্য। স্থানে স্থানে ভাষা ও ভাবের কথঞ্চিৎ অসঙ্গতি দোষ ঘটিয়াছে কিন্তু সেগুলি সত্ত্বেও যে, এই বইখানি শিশুদের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। বালকদের হস্তে পড়িয়া অল্পকাল মধ্যে একখানি হাসি ও খেলার যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছে তাহা দর্শন করিলে গ্রন্থ প্রণয়ন কর্তা এককালে শোক ও আনন্দ অনুভব করিবেন। এরূপ গ্রন্থের পক্ষে শিশু হস্তের অবিরল ব্যবহারে মলিন ও বিবর্ণ মলাট এবং বিচ্ছিন্নপ্রায় পত্রই সর্বাপেক্ষা অনুকূল সমালোচনা।"

আমার অনুমান, এই সমালোচনার পরেই রবীন্দ্রাথের সঙ্গো যোগীন্দ্রনাথের যোগাযোগ হয়েছিল। তার বেশ প্রমাণ রয়েছে পরবর্তী শিশু পাঠ্য—ঠিক শিশু পাঠ্য নয়, বালক পাঠ্য বইটিতে। এ বই 'ছবি ও গল্প' বেরিয়েছিল ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে। এই বইটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি ভালো কবিতা— প্রথমে 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত (১২৯২ সাল) পরে 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থে সংকলিত। 'ছবি ও গল্প'র পরবর্তী সংস্করণগুলিতে অনেক রচনার অদলবদল হয়েছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চারটি কবিতায় হস্তক্ষেপ করা হয়নি। এই কবিতা চারটি হল 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর', 'সাত ভাই চম্পা', 'হাসি রাশি' এবং 'মা লক্ষ্মী'। এছাড়া আরও দু একটি গল্পাত্মক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কলমের ছোঁয়া অনুমান করি (যেমন 'পথিক')। এমন কবিতা দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে পরিত্যক্ত হয়েছে। একটি—'সতীশের পড়া'— দ্বিতীয় সংস্করণেও ছিল, পরে বাদ দেওয়া হয়েছে। বাদ দেওয়ার কারণ কি স্বত্বাধিকারের দ্বৈধের ফলে?

প্রথমে বলি পুরানো ছড়াগুলির কথা। এগুলির নির্বাচন রবীন্দ্রনাথের দ্বারা এবং সংযোজন তাঁরই উৎসাহে বলে মনে করি। হাসিখুসি রচনার বছর দু তিন পরে যোগীন্দ্রনাথ 'খুকুমণির ছড়া' সংকলন করেছিলেন। খুকুমণির ছড়ায় সংকলিত যে দু একটি ছড়ার সঙ্গো হাসিখুসির ছড়ার মিল দেখা যায় তা কোনোকোনোটিতে সর্বাংশে নয়। এখানে হাসিখুসিতে উদ্ধৃত ছড়ায় রবীন্দ্রনাথের সংশোধন অনুমান করি। যেমন ধরুন, এই ছড়াটি—

তাই তাই তাই,
মাসীর বাড়ী যাই,
মাসীর বাড়ী ভারী মজা
কীল চড় নাই।

এখানে প্রচলিত ছড়াটির পাঠ আছে খুকুমণির ছড়াতে এই—

তাই তাই তাই
মামার বাড়ী যাই
মামা দিল দই সন্দেশ
গৈলে ব'সে খাই। ....

মামার বাড়ির পাঠই সংগত। সেকালে মামার বাড়ির সঙ্গো বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মাসির বাড়ির সম্পর্ক দৈবাৎ ছিল। দৈবাৎ বলছি এই জন্যে, যে কোনো কোনো ছড়ায় যে মাসির উল্লেখ দেখা যায় তা পিসির আঁচল ধরেই। এবং সেখানে পিসির সঙ্গো ঘনিষ্ঠতা ছিল, মাসির সঙ্গো নয়। অন্তত মেয়েলি ছড়ায় পক্ষপাত ছিল পিসির উপর, কিঞ্চিৎ বিরাগ ছিল মাসির উপর। যেমন—

মাসি পিসি কাটকাবাসী
কাবাস বনে ঘর,
কখনো মাসি বলে নাক
খই নাড়ুটা ধর।।

অর্থাৎ মাসি ও পিসি দুজনেই কাটনা কাটে এবং দুজনেরই কাপাসের খেত আছে। সুতরাং দুজনেরই সম্পন্ন গৃহস্থালি। মাসি কিন্তু তার বাড়ি গেলে কখনই একটা খইয়ের নাড়ু খেতে দেয় না।

তাহলে এখানে মামার স্থানে মাসি করবার দরকার কী ছিল? দরকার ছিল অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্য দিতে। রবীন্দ্রনাথের মাতুলালয় বলতে কিছু ছিল না, তাঁর শ্বশুরবাড়ি—তাঁর সন্তানদের মামার বাড়ী না থাকার মধ্যেই। সুতরাং মামার বাড়ির মজা রবীন্দ্রনাথ কেন, তাঁর আগেকার দু চার পুরুষও টের পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। এই কারণেই মামার স্থানে মাসির আবির্ভাব। অনুমানটিতে কল্পনার দৌড় একটু বেশি থাকলেও তা উপেক্ষণীয় নয়।

কয়েকটি ছড়া অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে মনে করি। যেমন—

খৈ আর দৈ দাও
বৈ রাখ তুলে,
কৈ মাছ ভাজা খেতে
শৈল গেছে ভুলে।

কিংবা

গৌর মাঝি হাল ধরেছে,
চৌদিকেতে পাল,
ওই নৌকা চড়ে দাদা
বৌ আনবে কাল।

(এই ছড়াটির সঙ্গো তুলনা করা যায় খুকুমণির ছড়ার থেকে একটি ছড়ার প্রথমার্ধের—

এক নৌকা আলো চাল,
এক নৌকা ঘি,
দাদা গেছে বিয়ে কত্তে
সওদাগরের ঝি।)

অথবা

আঃ কি আরাম !
এস দুঃখীরাম।
উঃ, কী শীত !
ক'সে গাও গীত।

বর্ণপরিচয়ের ছড়ার মধ্যে কোনো কোনো কলিতে রবীন্দ্রনাথের কলমের টান অনুভব হয়। যেমন—

ঔষধ খেতে মিছে বলা।
ঠাকুরদাদার শুকনো গাল।
পাখীর বাসা হাওয়ায় নড়ে।

বিসর্গযোগের পর দশ পর্যন্ত সংখ্যা শব্দ। তার পরেই পাঠ্য অংশ। এই অংশের প্রথম শীর্ষক 'ছবি আঁকা'। দুটি ছবি, একটি ছোট মেয়ের আর তার তলায় এই দু কলি, প্রশ্ন ও উত্তর—

খুকুরাণি, খুকুরাণি
ক'রছ তুমি কি?
এই দেখ না, কেমন আমি
ছবি এঁকেছি!

মেয়েটির বয়স বছর পাঁচেকের মতো। তার পরের শীর্ষক 'দেড় বছরের মিনি'। উপরে তিনটি ছোট মেয়ের ছবি। নীচে পাঠ। পাঠে মিনির ছেলেমানুষির বর্ণনা। শেষে এই কটি কথা আছে।

মিনির মেজ বোনের নাম রানী। ঐ দেখ—মিনি, রানী ও বেলা এই তিনজনে কেমন আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছে।

হাসিখুসি আমি অনেকবার উল্‌টে পাল্‌টে পড়েছি, পড়িয়েছি। কখনো এই কটি কথার তাৎপর্য আমার মগজে পৌঁছয়নি। সেদিন হঠাৎ চোখ খুলে গেল। তাই তো, এ তো রবীন্দ্রনাথের তিন কন্যা, যাদের বড় দুজনের ডাক নাম ছিল বেলা ও রানী। ছোটব ভালো নাম ছিল মীরা, ডাক নাম কী ছিল জানি না, হয়ত মিনি। (—এখানে কাবুলিওয়ালা গল্পের কন্যার নাম মনে পড়ছে, মিনি। মেজো মেয়ের ভালো নাম রেণুকা, ডাক নাম রানী, সুতরাং ছোট মেয়ের ভালো নাম মীরা, ডাক নাম মিনি হবে না কেন? তিন বোনের জন্ম যথাক্রমে ১৮৮৬, ১৮৯০ ও ১৮৯২। দুই পুত্র। তাদের জন্ম ১৮৮৮ ও ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে।)

এই তিন বোনের ছবির আগেকার পৃষ্ঠায় যে ছবির কথা আগে বলেছি সে হল মেজো বোনের। বড়ো ছেলে (ডাক নাম খোকা, ভালো নাম রথীন্দ্র) ছবি হল 'ঘোড়ার চড়া'। এখানে শুধু বড়ো ভাই আর বড়ো দু বোন। এই ছবির পাঠটিও রবীন্দ্রনাথের রচনা মনে করি। নইলে 'সামনেওয়ালা ভাগো' লিখবে কে?

রবীন্দ্রনাথের ছোট ছেলে (জন্ম ১৮৯৪) তখন এতই ছোট যে তার স্থান হাসিখুসিতে হয়নি।

পর্যায়ক্রমে তিন কন্যার নাম এমনিভাবে ব্যবহার করা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তখন আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না।

তিন

হাসিখুসির শেষ পাঠ 'দশটি ছেলে' বইটির বোধ করি শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ যা বেশি বয়স পর্যন্ত মনে থাকে। ছড়া-কবিতাটি ইংরেজি Ten Little Niggers ছড়া-কবিতার আদলে গড়া। এ কবিতাটির রচনায় যে দক্ষতা আছে তা সবটা যোগীন্দ্রবাবুর রচনা বলে মনে হয় না। বিশেষ করে 'হারাধন' নামটি তো নয়ই।

কবিতা-ছড়াটি একটি ইংরেজি হাসির গানের ঘনিষ্ঠ অনুকরণে লেখা। গানটি লিখেছিলেন ফ্রাংক গ্রীন (Frank Green) ১৮৬৮-৬৯ খ্রীস্টাব্দে। গানটি আবার একটি ছড়ার অনুকরণে লেখা। আমেরিকান ছড়াটি লিখেছিলেন সেপ্‌টিমাস্‌ উইনার অল্প কিছুকাল আগে। ইংরেজি ও আমেরিকান গান ছড়া দুটির প্রথম পদ এই—

ইংরেজি : Ten little nigger boys
went out to dine
One chocked his little self,
and there were nine.

আমেরিকান : Ten little injuns
standin' in a line
One chocked his
little self, and there
were nine.

বাংলা ছড়ায় সংখ্যা শব্দের মিলের অনুরোধে বর্ণনায় স্বতন্ত্র পথ ধরতে হয়েছে। তবুও মূলের আভাস মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে। যেমন ইংরেজিতে প্রথম পদটির ভাব পাই বাংলার তৃতীয়.পদে,

হারাধনের আটটি ছেলে বস্‌লে খেতে ভাত,
একটির পেট ফেটে গেল রইল বাকী সাত।

তুলনা করুন ইংরেজির চতুর্থ ও বাংলার দ্বিতীয় পদ—

Seven little nigger boys
chopping up sticks,
One chopped himself in half,
and then there were six.

হারাধনের নয়টি ছেলে কাটতে গেল কাঠ,
একটি কেটে দুখান হল রইল বাকী আট।

ইংরেজির সপ্তম ও বাংলার অষ্টম পদ,

Four little nigger boys,
going out to sea ;
A red herring swallowed one,
and then there were three.
হারাধনের তিনটি ছেলে ধরতে গেল রুই
একটি খেলে বোয়াল মাছে, রইল বাকী দুই।

বলা বাহুল্য এখানে হেরিং মাছের চেয়ে বোয়াল মাছ অনেক বেশি বাস্তব।

শেষ পদে ইংরাজি (এবং আমেরিকান) পাঠের মতো বাংলা পাঠও সমান সার্থক। বিলাত-আমেরিকায় ছেলেরা বিয়ে করে বাপ-মায়ের সংসার থেকে বিদায় নেয়। আমাদের দেশে শুধু বনে গেলে বা সন্ন্যাস নিলেই তা সম্ভব। বিদেশী গান-ছড়াটিতে দুঃখের সমাপ্তি নেই। তা রয়েছে বাংলা ছড়ায়।

ইংরেজি : One little nigger boy
living all alone,
He got married, and
then there was none.

আমেরিকান : One little injun
livin' all alone,
He got married and
then there was none.

বাংলা : হারাধনের একটি ছেলে কাঁদে
ভেউ ভেউ,
মনের দুঃখে বনে গেল,
রইল না আর কেউ।

রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম বার বিলাতে গিয়েছিলেন তখনও ইংরেজি হাসির গানটির বেশ চলন ছিল। সেখান থেকেই তিনি এটির সন্ধান পেয়েছিলেন বলে মনে হয়।

হাসিখুসি প্রথম ভাগের এই ছড়াটি বিয়োগ শেখাবার ছড়া। এটির আগে যোগ শেখাবার ছড়া আছে। সেটাতে রবীন্দ্রনাথের কলমের বিশেষ জলুসটুকু না থাকায় তার কৃতিত্ব যোগীন্দ্রনাথকে দিতে অনিচ্ছুক নই। তবে হারাধনের ছড়া-কবিতার যোগাত্মক রূপটি যা নাই হাসিখুসি দ্বিতীয় ভাগে তা মৌলিক। এ ভাগেও রবীন্দ্রনাথের রচনা আছে। বেশি বলব না 'সাতবার' ছড়াটি পড়লেই সকলে তা স্বীকার করবেন।

মহানগর, শারদীয় সংখ্যা ১৩৯১

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা

এক

সকলে জানেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা হল— ভূবনমোহিনী প্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুখসঙ্গিনী,— এই তিনখানি কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা। প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় চতুর্থ বর্ষে। ১২৮৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে। প্রবন্ধটিতে লেখকের নাম ছিল না, নামের নির্দেশও ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর জীবনস্মৃতিতে এই প্রবন্ধটিকে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গদ্য রচনা বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং প্রবন্ধটির লেখক সম্বন্ধে কোনো সংশয় নেই।

এখন আমি যে গদ্যরচনাকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গদ্যরচনা বলে দাবি করছি তা-ও ওই পত্রিকায় ওই বছরে কয়েক মাস আগে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল। এতেও লেখকের নাম অথবা নামের কোনো নির্দেশ ছিল না।

তাহলে কোন্ সাহসে আমি এ দাবি তুলছি?

দাবির পিছনে আমার সাহস নেই, আছে স্থির নিশ্চয়, যাকে ইংরেজিতে বলে conviction, তাই।

আমার এই স্থির নিশ্চয়তার হেতু কী?

হেতু আছে। দুটি। প্রথম হল প্রবন্ধের— আসলে প্রবন্ধমালার নাম। দ্বিতীয় হল প্রবন্ধমালার বস্তু ও ভাষা।

প্রবন্ধমালার শিরোনাম 'প্রলাপ-সাগর'। এই শিরোনামে পাঁচটি 'উচ্ছ্বাস'-এ পাঁচটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল যথাক্রমে ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, আষাঢ় ও আশ্বিন মাসে, ১২৮২-৮৩ সালে। তিন কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা প্রবন্ধটি বেরিয়েছিল প্রলাপ-সাগর শেষ হতে, কার্তিক ১২৮৩ সংখ্যায়। প্রবন্ধমালাটি যেন সমালোচনা-প্রবন্ধের উপক্রমণিকা।

পত্রিকাটিতে এই বছরেই ধারাবাহিকভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বনফুল' বেরিয়েছিল, প্রথম সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১২৮২) থেকেই। তাঁর আরও কিছু কবিতা বেরিয়েছিল এই বছরে। কোনোটিতেই রবীন্দ্রনাথের নাম অথবা নামের সংকেত ছিল না। একটি ছোট কবিতা ছাড়া অন্য ছুটকো কবিতাগুলো বেরিয়েছিল 'প্রলাপ' নামে (অগ্রাহায়ণ ১২৮১—বনফুল প্রথম কিস্তির আগে, ফাল্গুন ১২৮১, এবং বৈশাখ ১২৮৩)। বৎসরান্তে মাসিক পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ খণ্ডটির যে সূচিপত্র আছে তাতে প্রলাপ শীর্ষক কবিতামালার নাম দেওয়া আছে 'প্রলাপ (পদ্য)'। এই উল্লেখটি অনুধাবনযোগ্য। যে কবিতাগুলি 'প্রলাপ' নামে তিন তিন সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল সেগুলিকে এখন 'প্রলাপ (পদ্য)' বলা হল কেন?

সহজ উত্তর। 'প্রলাপ-সাগর' নামের সঙ্গো যোগাযোগ জ্ঞাপনের জন্যে। 'প্রলাপ'-এর দ্বিতীয় কিস্তি আর 'প্রলাপ-সাগর'-এর প্রথম তরঙ্গা একই সালে বেরিয়েছিল, ফাল্গুন ১২৮২ সংখ্যায়। আগে 'প্রলাপ সাগর' (পৃষ্ঠা ১৫৯), পরে 'প্রলাপ' (পৃষ্ঠা ১৯২)।

'প্রলাপ' বা 'প্রলাপ (পদ্য)' সম্বন্ধেও আমাদের সংশয় নেই। কেননা রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখে গেছেন:

> এ পর্যন্ত যাহা কিছু লিখিতেছিলাম তাহার প্রচার আপনা আপনির মধ্যেই বদ্ধ ছিল। এমন সময় জ্ঞানাঙ্কুর নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অঙ্কুরোদ্‌গত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পদ্যপ্রলাপ নির্বিচারে তাঁহারা বাহির করতে শুরু করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মধ্যে "সমস্ত পদ্য-প্রলাপ নির্বিচারে" কথাটুকুর একটু বিশেষ তাৎপর্য আমার মনে লাগছে। এর দ্বারা রবীন্দ্রনাথ কি তাঁর গদ্য-প্রলাপ 'প্রলাপ-সাগর'-কে ভুলতে চেয়েছিলেন? "নির্বিচারে" পদটি প্রলাপ-সাগরের পক্ষেই প্রযোজ্য। এতে যে পরিমাণ কাঁচা হাতের পরিচয় আছে, তা "পদ্য"-প্রলাপে নেই। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রথম প্রকাশিত গদ্যরচনাকে ভুলে যেতে পেরেছিলেন। পদ্যে প্রলাপকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রলাপ-সাগরের উল্লেখও করেননি।

'প্রলাপ-সাগর' কাঁচা হাতের লেখা, সন্দেহ নেই। কিন্তু ভাবে ও ভাষার ঢঙে যে বুদ্ধির ও কৌশলের ছাপ আছে তা যে রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব সে কথা বুঝতে একটুকুও দেরি হবে না তাঁদের যাঁরা রবীন্দ্রনাথের লেখা মন দিয়ে পড়েছেন।

পরবর্তীকালের রবীন্দ্ররচনায় এই বাল্য-রচনাটির প্রতিভাস কিছু কিছু পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গো মনে পড়ছে তাঁর প্রথম যৌবনের দুটি রচনা, 'ভানু সিংহ ঠাকুরের জীবনী' ও 'রসিকতার ফলাফল'।

এইবার প্রলাপ-সাগর জরিপ করি।

দুই

প্রলাপ-সাগর

প্রথম উচ্ছ্বাস

আভিধানিক প্রসঙ্গা।

> এখন গ্রন্থ লেখা লোকের একটি বাতিক হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থের দ্বারা দেশের বা শিক্ষার্থীগণের কিছু উপকার হউক বা না হউক, গ্রন্থকার নামে সাধারণে পরিচিত হওয়া সেই সকল লেখকদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। আজি-কালি অনেক অভিধান বাহির হইতেছে, কিন্তু সেগুলি বাস্তবিক কোন কার্যকর হইতেছে কি না কেহই তাহার বিচার করেন না। আমার বিবেচনায় একখানি অভিধানও

প্রয়োজনোপযোগী হয় নাই। অনেকে আমার কথায় উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থকার মাত্রেরই অদৃষ্ট সমান একথা বলিতে পারিনা। প্রথমে উপহাসাস্পদ হইলেও পরিণামে আমি যে একজন প্রশংসাভাজন হইয়া পড়িব, ইহাতে কোন সংশয় নাই। আমি এককালে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রচারে কৃতসংকল্প হইয়াছি, কিন্তু প্রথমে এককালে বহু অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অপেক্ষা সকল বিষয়ের একটু একটু আদর্শ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলাম ; পাঠকবর্গ তাহাতেই আমার ক্ষমতার পরিচয় পাইবেন। আমার এই অভিধানে বাঙলা ও ইংরেজী উভয়বিধ শব্দেরই ব্যুৎপত্তি পাওয়া যাইবে। শব্দের অর্থ সংঘটনের কারণ পরম্পরা অবগত হইলে তাহা যেমন হৃদয়ঙ্গাম হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। আমি এক্ষণে ইহা অকারাদি বর্ণক্রমে প্রকাশ করিলাম না, আদর্শস্বরূপে কয়েকটি শব্দ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণ অবহিত হইয়া পাঠ করিলে সমুদয় শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

এই ভূমিকা করে লেখক এগারোটি শব্দের উদাহরণ দিয়েছেন তাঁর আদর্শ অভিধানের নমুনা হিসাবে। তাঁর অভিধানে থাকবে ব্যুৎপত্তি ধরে অর্থ পরম্পরার অনুসরণ। এগারোটি শব্দ হল এই, নটি বাংলা দুটি ইংরেজি : অসুর, নারদ, ইন্দ্রজাল, ভূগোলবিদ্যা, কোকিল, মদ, বিপদ, মুখবন্ধ, লেজী Lazy, একশেষ Excess, সারদা।

অসুর—প্রচলিত অর্থ দৈত্য, দানব ইত্যাদি। আমার সঙ্কলিত অর্থ 'যাহার সুর বোধ নাই'। যে ব্যক্তির সুর বোধ নাই, তাহাকে অন্-সুরো বলিয়া থাকে। বাস্তবিক যাহার সুর বোধ নাই সে ব্যক্তি অসার। সঙ্গীতেই সুরবোধের প্রয়োজন অন্য কিছুতে সে প্রয়োজন নাই, এ কথা নিতান্ত অসঙ্গাত। সকল বিষয়েই সুরবোধ থাকা অতি আবশ্যক। সুরবোধ এই শব্দদ্বয় সকল বিষয়েই খাটিতে পারে। অমুক ব্যক্তি ভারি তালকানা একথা বলিলে যে, সে ব্যক্তির সঙ্গীত বিষয়ে ভাষা বোধ নাই বুঝাইবে, এমন নহে।...দৈত্যে বলিলেই যে অসার অপদার্থ, এক নিকৃষ্ট ও ভয়ানক জীব বুঝায়, সুর না থাকায় তার প্রধান কারণ।

নারদ,—প্রচলিত অর্থ "ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি বিশেষ।" আমার সঙ্কলিত অর্থ "যাহার রদ অর্থাৎ দন্ত নাই।" বৃদ্ধ হইলেই দাঁত পড়িয়া যায়, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন।...তবে এখন এই প্রশ্ন হইতে পারে যে নারদ শব্দে যদি রদবিহীন, বৃদ্ধ, বাচাল ও বহুভাষী হইল, তবে আর ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষিকে বুঝায় কেন। পঙ্কজ শব্দে, যে পঙ্কে জন্মে, এই মাত্র হইলে শুদ্ধ পদ্মকে বুঝায় কেন ? সেই জন্যই নারদ বলিলে সেই দেবর্ষিকে বুঝায়, অন্য কাহাকেও বুঝাইবে না।

ইন্দ্রজাল;—ভোজবাজী। আমার কৃত ব্যাখ্যা এই;—ইন্দ্র দেবরাজ, আর

জাল শব্দে মৎস্যাদি ধরিবার চির প্রসিদ্ধ সূত্র যন্ত্র বিশেষ। অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে, বারোয়ারি পূজা, অথবা রাসযাত্রার ও রথযাত্রার মহোৎসব সময়ে পথমধ্যস্থলে একখানি জাল টাঙ্গানো হইয়া থাকে। তাহাতে সোলার মাছ কচ্ছপ, কুম্ভীর, পদ্ম ফুল প্রভৃতি বিবিধ খেলনা ঝুলিতে থাকে। সেই জালের নাম ইন্দ্রজাল। ইন্দ্রজাল শব্দের অর্থ যে ভোজবিদ্যা, ইহাই তাহার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভোজবিদ্যার প্রভাব ভিন্ন, মৎস্য, কচ্ছপ, কুম্ভীর এত অল্প আয়তন স্থানের মধ্যে থাকিবার সম্ভাবনা নাই। দেবতার জাল বলিয়া দৈবশক্তি প্রভাবে এই সকল ঘটনা ঘটিয়া থাকে। জাল শব্দে মৎস্যাদি ধরিবার জাল অর্থ না করিয়া যদি কপটতা ও জুয়াচুরি করা যায় তাহা হইলে ইন্দ্রজাল শব্দে ভোজবাজী প্রতিপন্ন হইতে পারে। জাল নোট, জাল দলিল ইত্যাদি সকলেই শুনিয়াছেন। জাল ধরা বড় কঠিন।....ভোজবাজী মিথ্যা বলিয়াও ধরা কঠিন। মানুষের কৃত জাল যখন মানুষে ধরিতে অশক্ত, তখন ইন্দ্রের জাল ধরে সাধ্য কার!

ভূগোলবিদ্যা ;—প্রচলিত অর্থ, " যে বিদ্যার দ্বারা পৃথিবীর আকৃতি, ধর্ম, বিভাস, গতি প্রভৃতি জ্ঞাত হওয়া যায়।" আমি বলি "যে বিদ্যা শিখিতে হইলে দেশের ভূয়োগোল উপস্থিত হয়, তাহাকেই ভূগোলবিদ্যা কহে।" ভূগোল তত্ত্ব বিষয়ক যাবতীয় বিষয়ই কি নিঃসংশয়ে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে ? ভূগোল তত্ত্ব বিষয়ে অদ্যাপি নানা মুনির নানা মত রহিয়াছে। পৃথিবীব গোল কি ডিম্বাকৃতি কি চক্রাকার, অদ্যাপি কেহ তাহা স্থির করিতে পারেন না।...

কোকিল ; —প্রচলিত অর্থ "স্বনাম প্রসিদ্ধ পক্ষী।" আমার সঙ্কলিত অর্থ "কন্দর্পের উকিল।" ক-বর্ণে নানা অর্থ অভিধানে শুনি—যথা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কন্দর্প, অগ্নি, বায়ু ইত্যাদি। বসন্ত সমীপে কন্দর্পের হইয়া দুটি কথা কয়, এমন যারা আছে, তন্মধ্যে কোকিল সর্ব প্রধান। কন্দর্পের পক্ষ সমর্থনার্থে সে এত চীৎকার করে যে বসন্তের অন্তর্ধানে প্রায়ই তাহার গলা ভাঙ্গিয়া যায়। এইজন্যই বলি, "ক-উকিল, কোকিল।"

মদ,—প্রচলিত অর্থ সুরা। আমার সঙ্কলিত অর্থ বিষদাতা। ম বর্ণের অর্থ অনেক, তন্মধ্যে বিষ একটী। আর দ বর্ণে যে দানকরে তাহাকে বুঝায়, যেমন ধনদ, বারিদ ইত্যাদি। বিষদাতাকে আমরা যে প্রকার ভয় করি, মদকেও তেমনি ভয় করা উচিত। বিষে প্রাণনাশ হয়, মদেও প্রাণনাশ হয় সুতরাং বিষদ শব্দে যে মদ বুঝাইবে, তাহাকে আর বিচিত্র কি?

বিপদ,—প্রচলিত অর্থ বিপত্তি দুর্ভাগ্য, বিনাশ। আমি বলি বি শব্দের অর্থ অভাব, গতি, বৈপরিত্য, অসহন ইত্যাদি এবং পদ শব্দে পা ও চাকরী। পায়ের বা চাকরীর অভাব সুতরাং বিপদ; চাকরীর গতি বা গমন সুতরাং বিপদ; পায়ের বা চাকরীর বৈপরিত্য সুতরাং বিপদ; পায়ের অসহন সুতরাং বিপদ।

মুখবন্ধ,—প্রচলিত অর্থ "কোন গ্রন্থে বা গল্প রচনার প্রারম্ভে প্রকৃতি বিষয় উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে নানা কথা প্রসঙ্গ।" আমার সঙ্কলিত অর্থ, "মুখ আটকানো।" "এ গ্রন্থখানি লেখার উদ্দেশ্য কি?" গ্রন্থ পাঠ সময়ে পাঠকের মনে প্রায়ই এরূপ প্রশ্ন উদয় হয়। বিজ্ঞাপন পাঠে সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, সুতরাং তাহাতেই পাঠকের মুখ বন্ধ হয়। এই কারণেই বিজ্ঞাপনের নাম মুখবন্ধ হইয়াছে।

লেজী, Lazy—অলস; আমার মতে "লেজ আছে যার, সেই লেজী।" জগদীশ্বর পশুগণের শারীরিক শোভা সংবর্দ্ধনের জন্য লাঙ্গুল দেন নাই।......লাঙ্গুল বিশিষ্ট জীব মাত্রেই অনায়াস লব্ধ আহারে পরিতৃপ্ত থাকে, সুখ সৌকর্য্যার্থে তাহাদিগের কোন চেষ্টাই নাই। এরূপ জীবকে অলস না বলিয়া আর কাহাকে বলিব? এই জন্য লেজী শব্দের অর্থ অলস হইয়াছে।

একশেষ, Excess;—একশেষ। এ শব্দটী ইংরেজরা কোথায় পাইলেন। একটী সুর পরিবর্ত্তন করিয়া তবে ত সকল কথাকেই ইংরাজী করা যাইতে পারে। এমন কথা চুরি কত ধরা যাইতে পারে তাহার শেষ করা যায় না। বাক্‌চোর্যের দণ্ড নাই, তাই রক্ষা, নচেৎ এ জন্য সর্ব্বনাশ হইতে পারিত। এস্থলে সুর পরিবর্ত্তনের একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। একটী বালক রথ দেখিতে গিয়াছে, তাহাকে আর কতকগুলি বালক জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি লেখাপড়া করে থাকে?" সে ইংরাজী না জানিয়াও কহিল "আমি ইংরাজী পড়ি।" তাহারা জিজ্ঞাসা করিল "বল দেখি, পায়রার ইংরাজী কি?" বালক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আর কোন উপায় না পাইয়া ইংরাজী সুরে কহিল "পায়রা দি কপিটুর।' বালকেরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া ভাবিল, "হবেই বা।" তাহারা অপ্রতিভ হইল। বালক হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

সারদা;—দুর্গা, আমি বলি "হাড়দহ"। সারদা শব্দের অপভ্রংশে হাড়দহ হইয়াছে। ইহা একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সুস্পষ্ট বোধ হইবে। 'স' স্থানে হ' অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়।....অদ্যাপি বঙ্গাদেশে স স্থানে হ ব্যবহার করে। শিব—হিব তাহার প্রমাণ। 'র' স্থানে 'ড়' সংস্কৃতে ব্যবহার আছে; 'ডরলয়োঃ' তাহার প্রমাণ। অতএব সার শব্দে হাড় পর্যন্ত পাওয়া গেল, দা শব্দে দহ ইহা বুঝাইতে কোন কষ্ট নাই চাকদহ—চাক্‌দা; খড়দহ—খড়দা ইত্যাদি। এই জন্য বলি সারদা শব্দে—হাড়দহ বুঝায়। দুর্গা যখন যার গৃহে আসেন, হাড় না জ্বালাইয়া যান না। দুর্গোৎসবের ব্যাপার যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। সুতরাং ইহার আর বাহুল্য করিলাম না। সারদা শব্দে সরস্বতী বুঝায়। সার দেন যিনি, তিনি সরস্বতী ভিন্ন আর কি হইতে পারেন! বিদ্যা ভিন্ন মানুষেরা সারবত্তা জন্মায় না, সুতরাং বিদ্যাই সার পদার্থ। সরস্বতীর অনুগ্রহ ভিন্ন বিদ্যা লাভ হয় না, এই জন্যই সারদা শব্দে সরস্বতী বুঝায়।

তিন

প্রলাপ সাগরের দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসের নাম 'সাহিত্যিক তরঙ্গ'। এ প্রবন্ধে সাহিত্যের এই শ্রেণী বিভাগগুলির আদর্শ আলোচিত হয়েছে,—পদ্যলেখা, গদ্যলেখা, উপন্যাস লেখা, নাটক লেখা ও দেশীয় সংবাদপত্র।

আরম্ভ এই রকম,

সাহিত্যই ভাষার জীবন। সাহিত্য গ্রন্থের বহুল প্রচার ভিন্ন কখনই ভাষার সৌন্দর্য সম্পাদিত হয় না। সাহিত্যের অনেক শ্রেণী বিভাগ আছে, সেই সকলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ ভিন্ন ভাষাজ্ঞান হয় না। ...পূর্ব খণ্ডে মৎপ্রণীত আভিধানিক তরঙ্গে পাঠকবর্গ আমার পরিশ্রম ফল জ্ঞান হইয়াছেন; এবার আমি তাঁহাদিগকে কাব্য লিখা প্রণালী শিক্ষা দিব। ...আমার প্রথম রচনা পদ্য, সেই জন্যই আমি প্রথমে পদ্য প্রচার করিতে বাধ্য হইলাম, তৎপরে ক্রমান্বয়ে গদ্য কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি প্রকাশ করিব।

তারপর লেখক দিয়েছেন শিরোনামা "অমিত্রাক্ষর লেখার আদর্শ", তারপরে উপ-শিরোনামা "শৈলধন্বা গার্ণীকরণ"। তারপর আদর্শ রচনার নমুনা, আঠারো ছত্রে।

ত্রিদৃক্ বিগানাকর্ণি শৈলেশ কন্যকা
বিগত জীবিতা সতী পিতৃ নিকেতনে,
শূলোপরি শৈলধন্বা গ্রন্থিয়া সে বপু
পাকে,—পদ ভরে টলমল করে ধরা।
দর্শনি পাণ্ডুবায়ন চক্রে খণ্ডে খণ্ডে।
করি ফেলে ধরা পৃষ্ঠে—দূর দূরান্তরে।
তারপরে পুরীমোহ কর্ণ সীমন্তিনী
উদ্ভবিলা পর্ব্বতের গেহে, শৈলপত্র
লয়ে সদা শৈলধন্বে পূজে, ঋষিকেশে
পাইবার আশে। রঙ্গাহীন বৃদ্ধ—হায়,
সম্বন্ধিলা, পাগল মহেশে, কাকোদর
শোভে যার শিরে। দুশ্চ্যবন আদি দেব
সকলে মিলিয়া পাত্র, আনিল সভায়।
বৃষভ পালকী, নাহি বরারক কণ্ঠে,
না আছে বরুত্র, নাহি পরিধেয় চীর।
কালের সর্ব্বাঙ্গে কাল, পুরীমোহ কর্ণে
শুভ্র কান্তি শুভ দাতা উন্মাদ উমেশ।
বিভিল উমায়, দেয় সবে হুলু ধ্বনি।

এখন অমিত্রাক্ষর ছন্দ সকলের প্রিয় বলিয়াই উপরিউক্ত বিষয় উদ্ধৃত করিলাম।

সমসাময়িক পাঠকবর্গ এই দুরূহ কবিতাটিকে কীভাবে নিয়েছেন জানি না। তবে আমি যদি কবিতাটির ব্যাখ্যা না করে দিই তবে লেখকের প্রতি অবজ্ঞা এবং এখনকার পাঠকবর্গের সঙ্গো বঞ্চনা করা হবে। তাই এটির টীকা করে দিচ্ছি।

বিষয় হল সতীর দেহত্যাগের পর শিবের আচরণ, দেবীর জন্মলাভ হিমালয়ের ঘরে। শিবকে বিবাহ করবার জন্য তাঁর শিবপূজা, নারদ কর্তৃক বিবাহ সম্বন্ধ। ও শিব-উমা বিবাহ।

ত্রিদৃক্—ত্রিনেত্র, শিব। বিগনাকর্নি—বিলাপধ্বনি শুনে। শৈলধন্বা—পাষাণধনু, শিবের এক নাম। গ্রন্থিয়া—গেঁধে, বিঁধে। দর্শনি—দর্শন করে, দেখে। পাণ্ডবায়ন পাণ্ডবদের আশ্রয় কৃষ্ণ, বিষ্ণু। পুরীমোহ কর্ণ—যাঁর কানে ধুতরা ফুল গোঁজা। উদ্ভবিলা—জন্ম নিলেন। শৈলপত্র—বেলপাতা। ঋষিকেশে—হৃষীকেশকে, ইন্দ্রিয়জয়ী শিবকে। রঙ্গাহীন—ফোকলা, (প্রথম তরঙ্গা নারদ শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্রষ্টব্য)। সম্বন্ধিলা—বিবাহ সম্বন্ধ করলেন। কাকোদর—সাপ। দুশ্চ্যবন—ইন্দ্র। পাত্র—বরযাত্রী। বরারক—বরমাল্য (?) বরুত্র—উড়ানি, জামা। কালের সর্বাঙ্গো কাল—মহাকাল শিবের অঙ্গো অঙ্গো জড়িয়ে আছে কালসর্প। পুরীমোহ—ধুতরা ফুল। বিভিল—বিবাহ করলেন। তারপর, "অমিত্রাক্ষর লেখকের প্রতি উপদেশ।"

১। সম্মুখে একখানি অভিধান খুলিয়া বসিবে, বাছিয়া বাছিয়া অপ্রসিদ্ধ আভিধানিক শব্দ সঙ্কলন করিয়া সন্নিবেশ করিবে।

২। যত কূটার্থ করিতে পার, তাহা সাধ্য মতে ত্রুটী করিবে না।

৩। অন্বয় করিবার নিয়মগুলিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবে।

৪। অলঙ্কারের দোষের ছড়াছড়ী করিবে।

তারপরে "মিত্রাক্ষরের আদর্শ।"

চল চল প্রিয় সখী চঞ্চল চরণে,
নতুবা নিশ্চয় হবে তোমার মরণে।
তোমার মরণে আমি কতই কাঁদিব,
হাউ হাউ করে কেঁদে চক্ষু ফুলাইব।
পড়িবে সর্ব্বদা চক্ষে জল টস্ টস্,
নাসিকা করিবে সদা ফস্ ফস্ ফস্।
ঝাড়িব নাসিকা আমি শত শত বার,
ছন ছন করিবে নাক, সর্দি হবে আর।
অধিক লিখিতে হল পুথি বেড়ে যায়,
মরো না মরো না সখী, হায় হায় হায়।

মিত্রাক্ষর লেখকের প্রতি উপদেশ।

১। প্রতি ছত্রে যেন ১৪টী করিয়া অক্ষর থাকে।

২। অর্থ থাকুক বা না থাকুক, শেষ কথা টানিয়া মিলাইয়া দিবে।

৩। ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিবে না, সমুদায় লেখা হইলে অভাবও থাকিবে না, পাঠক টানিয়া ভাব বাহির করিবেন।

[তিনের নম্বর উপদেশটিতে লেখকের দিব্য ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির পরিচয় আছে। এখন বাংলায় "সাম্প্রতিক কবিতা" বলে যা চলেছে তাতে ভাবও নেই, অ-ভাবও নেই। ভার পাঠকের উপর, টেনে হেঁচড়ে মানে করবার।]

তারপরে "গদ্য লেখার আদর্শ।"

বসুন্ধরা নিস্তব্ধা, কেননা সন্ধ্যা সমাগতা, তৎকরণক অন্ধকারাবৃতা প্রেতিনী সদৃশা কিম্ভূতা জন্তু বিশিষ্ট দর্শনে ভীতা; সুতরাং নিস্তব্ধা। চিত্ত ভয়াতুরাচ্ছন্ন, এতৎভাবাপন্ন চিত্ত ভয়বিহ্বল না হইবে কেন? সমাগত সন্ধ্যা নিতান্ত সহজ সন্ধ্যা নহে, অমানিশির সমাগম। হোরা দ্বিপ্রহরা বিভাচরী গতে আর্য্য গৃহস্ত গৃহে নৃমুণ্ডমালিনী কপালিনী শিবমোহিনী মহাকাল হৃদিবিলাসিনী রণোন্মত্তা শ্যামা মায়ের আবির্ভাব হইবে।

তারপর "গদ্য লেখকের প্রতি উপদেশ।"

১। সরল লিখিবার চেষ্টা করিলে ঠকিবে।

২। উৎকৃষ্ট শব্দ ব্যবহারে কৃপণতা করিবে না।

৩। একধার হইতে বর্ণনা করিয়া যাইবে, লাগে তীর, না লাগে তুক্কা।

৪। বিশেষণের শ্রাদ্ধ করিবে।

৫। একনিঃশ্বাসে যতখানি দৌড় দিতে পার, যাইয়া হাঁপ ফেলিবে অর্থাৎ ছেদ দিবে।

আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই, যে বুদ্ধিমান হইবে সে দুকথায় বুঝিয়া লইতে পারিবে। মুর্খের ধন্দ লাগিবে, তার সন্দেহ কি।

তারপর "উপন্যাস লেখার আদর্শ।"

বরবর্ণিনী হাসিলেন,—সুলোচনা আবার হাসিলেন,—ওষ্ঠের সীমাদ্বয় কিঞ্চিৎ ফেরানো হইল। কি মধুর হাসি—পাঠক চেয়ে দেখ, ছিঃ—তুমি এমন বদরসিক,—এমন সময়ে চক্ষের পলক ফেলিলে। তোমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ—আমি কি করিব।....এখন পাঠক অন্যদিকে চল, আর কিছু নূতন দেখিতে পাইবে।

দেবালয়ে ঘণ্টা বাজিল,—আবাব বাজিল,—সকলে তটস্থ হইয়া দেবালয়ের দিকে দৌড়িতে লাগিল। আবার ঘন্টা বাজিল,—আবার তিনবার বাজিল, —কেন এত বাজে? বলিতে বলিতে আবার তিনবার বাজিল। পাঠক কিছু বুঝিতে পারিলে? উপন্যাসে এমন বাজিয়া থাকে—দরকার নাই তথাপি বাজিবে, তোমার ইচ্ছা না হয়, কানে আঙুল দিয়া থাক, কিন্তু তথাপি বাজিবে। পাঠক কহিলেন,—বাজুক, আমার তায় কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

তারপর "উপন্যাস লেখকের প্রতি উপদেশ।"

যুবক! তোমার উপন্যাস লিখিতে ইচ্ছা হইয়াছে? হইতে পারে—এ তোমাদেরই কাজ, কিন্তু আমার এই উপদেশ কয়টীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লিখিবে,—খুব বাহবা পাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

১। আর যাহা কিছু পার না পার, মধ্যে মধ্যে পাঠককে লইয়া বিলক্ষণ টানাটানী করিবে। এমন করিবে, পাঠক যেন চোর দায় ধরা পড়িয়াছেন। তুমি নিজে আবোল-তাবোল বলিবে কিন্তু তাহার সাফাই করিবার জন্য পাঠককে সং সাজাইতে কসুর করিবে না।

২। আলঙ্কারিকদিগের পুনরুক্তি দোষকে দোষ বলিয়া গ্রাহ্য করিবে না। যত পুনরুক্তি করিবে তত আসর জমিবে।

৩। ব্যাকরণের মস্তকে পদাঘাত না করিলে তোমার উপন্যাস ভাল হইবে না।

৪। বঙ্গভাষাকেই একমাত্র অবলম্বন করিলে লেখা ভাল হইবে না, ভাষান্তরের আশ্রয় লইবে।

সকল নিয়মই যদি এই স্থানে লিখিয়া শেষ করি, তবে আমি যে অলঙ্কার গ্রন্থ প্রস্তুত করিতেছি, তাহা কেহ ক্রয় করিবে না। সেই জন্যই আর আপনার পায় আপনি কুঠারাঘাত করিব না। সময় অল্প,—অন্য বিষয়ের অবতারণা করি।

তারপর "নাটক লেখার আদর্শ।"

কমলিনী। বলি--ও কি করিতেছ?

অধর। ভাত খাইতেছি।

কম। ভাত খাইবার বুঝি আর সময় পেলে না! রাত্রি কত হয়েছে,—শীঘ্র ভাত থুয়ে ওঠ,—চল শুয়ে দু-দন্ড আয়েস করা যাক।

অধর। তথাস্তু—(অমনি উঠিলেন)

আর লিখিতে হইলে ভদ্র রুচির বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে সুতরাং লিখিলাম না, লেখকদিগকে নিয়ম কয়টী শিখাইয়া দিলেই কার্য হইবে।

তারপর "নাটক লেখকের প্রতি উপদেশ।"

যুবক। তুমি নাটক লিখিবার জন্য নিতান্ত ব্যস্ত হইয়াছ। বঙ্গদেশের নিতান্ত দুর্ভাগ্য, নচেৎ তোমার মত লোকেদের হাতে এমন কার্যের ভার পড়িবে কেন? যাহা হউক উপদেশ কয়টী অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ;—

১। অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতার যত পরিচয় দিতে পারিবে, ততই নাটক ভাল হইবে। সে বিষয়ে তুমি সঙ্কুচিত হইলে চলিবে না। তোমাকে আমি উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

বঙ্গদেশের প্রধান নাটককারের গ্রন্থগুলি পাঠ করিলেই তোমার জ্ঞান জন্মিবে। বল দেখি—তাহার কোনখানি সুপাঠ্য? কোন্‌খানি তুমি গুরুজনের নিকট বসিয়া পাঠ করিতে পার? কোন্‌খানি তুমি পাঠ করিবার জন্য তোমার

সরলা সহধর্মিণীর হাতে দিতে পার? তুমি স্পষ্টাভিধানে বলিবে—'একখানিও না'; কিন্তু বাজার বিক্রি খুব। নাটক লিখিতে হইলে সভ্যতার অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া অসভ্যের আসরে নামিবে তাহা হইলে কৃতকার্য হইতে পারিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

২। অস্বাভাবিক বর্ণনা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। একবার সাক্ষাতেই প্রণয়ীযুগলকে পাগল করিতে হইবে। প্রণয়ী সাহেব হইলে প্রণয়িনীকে প্রথম দর্শনেই বিবি সাজাইতে হইবে। না পার—তোমার বিবেককে নিবারণ করে, তোমার বিবেক লইয়া ধুইয়া খাও—তোমার নাটক ভাল হইবে না।

৩। যেখানে যে গল্পটী শুনিবে, বাটী আসিয়া তাহা নোটবুকে লিখিয়া রাখিবে। সময় বুঝিয়া নাটক মধ্যে সে সমস্ত ছাড়িতে পারিলেই সকলে সন্তুষ্ট হইবেন।

৪। যদি নাটক মধ্যে কোন সাহেবকে আনিয়া বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিতে পার, তাহা হইলে আর বাহবার সীমা থাকিবে না।

৫। আমাদের বীরতা নাই, কিন্তু মুখে যারপরনাই বীরতা দেখাইতে হইবে।

৬। বঙ্গীয়া স্ত্রীলোকদের হাতে শতমুখী দিয়া পুরুষের বাপ নির্বংশ করাইতে পারিলে দর্শকের হাসির সীমা থাকিবে না।

সব লিখিলে কাজ চলিবে কেন, সুতরাং এই স্থানেই নাটক সম্বন্ধে বিশ্রাম।

তারপর "দেশীয় সংবাদপত্র।"

দেশীয় সংবাদপত্র সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিলে প্রস্তাব অসম্পূর্ণ থাকে, এই জন্য এ বিষয়ের অবতারণা করা গেল।

কোন ভাষায় রীতিমত শিক্ষিত না হইয়া কখন সেই ভাষায় কোন প্রস্তাব লেখা যায় না। বঙ্গভাষার সংবাদপত্র সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটে না। বাঙ্গালা ভাষা না শিখিয়াও বঙ্গালা সংবাদপত্র চালান যাইতে পারে। কেহ কেহ কহিতে পারেন, মাতৃভাষায় ইহা এক প্রকার চলিতে পারে; সে কথা নিতান্ত অন্যায়।

.........কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত হইয়া ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষকে গালি দিতে পারিলেই কাগজের গৌরব, ইহাই অধিকাংশ সম্পাদকের ধ্রুব জ্ঞান হইয়াছে। যদি কেহ উপযুক্ত সম্পাদক হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি আমার এই উপদেশ বাক্যগুলি শ্রবণ করুন।

১। যাহাতে ছাপা পরিষ্কাররূপে না উঠে, এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবে।

২। রুল ও লাইন প্রভৃতি যত আঁকাবাঁকা হয়, ততই ভাল।

৩। বর্ণাশুদ্ধি যত অধিক থাকিবে, ততই কাগজ গৌরবের হইবে।

৪। প্রস্তাবের কিয়দংশ পাঠ করিতে করিতে অবশিষ্ট অংশ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অন্য প্রস্তাব পাঠ করিতে করিতে ২/৩ পৃষ্ঠা পরে পূর্ব প্রস্তাবের অবশিষ্ট অংশ পাঠকের চক্ষে পড়িয়া ধাঁধা লাগিবে।

৫। দুই একটি প্যারাগ্রাফের অর্থ সঙ্গতি না হইলে ভাল হয়।

৬। অমুক ব্যক্তি বেশ্যাসক্ত, অমুকের এত দেনা, অমুক সুরাপায়ী ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যাপার লিখিতে কুণ্ঠিত হইবে না।

৭। যাহা মনে আসিবে, তাহাই লিখিবে, কাহারও মুখাপেক্ষা করিবে না।

৮। সাধারণের গুণ অন্বেষণ করিবে না, কেবল দোষ অনুসন্ধান করাই স্থির সংকল্প করিবে।

৯। প্রতি কথায় স্বার্থসিদ্ধির মূর্তি প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিবে না।

১০। প্রতি সংখ্যায় গভর্নমেন্টের উপর এক হাত চাই, কিন্তু একবার হাতে পাইলে মাথায় করিবে।

১১। যাহাকে অদ্য কটূক্তি করিবে কল্য প্রয়োজন হইলে তাহাকে পূজা করিবে।

১২। ভাষায় যত গ্রাম্যতা দোষ হইবে, ততই গ্রাহক বাড়িবে।

অধিক লেখার প্রয়োজন নাই, কতিপয় প্রসিদ্ধ পত্রিকাকে আদর্শ করিলেই সকল বুঝিতে পারিবে।

অদ্য এই পর্যন্ত।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসের প্রস্তাবগুলি প্রথম উচ্ছ্বাসের প্রস্তাবের মতো আদ্যন্ত কৌতুকময় নয়। এখানে কৌতুকরস ক্ষীণ, ব্যঙ্গরসই প্রধান ও তীক্ষ্ণ। সেই সঙ্গে তথ্যভাষণও বেশ আছে। কাব্যের দুটি উদাহরণে যথাক্রমে মাইকেলী ও ঈশ্বরীগুপ্তীয় ঢঙের প্যারডি। উপন্যাসের আলোচনায় বঙ্কিমী ঢং আর নাটকের আলোচনায় দীনবন্ধু ও উপেন দাসের রীতি ব্যঙ্গের বিষয়। গদ্যের আলোচনায় উদ্দিষ্ট মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারেব ষ্টাইল। সংবাদপত্রের আলোচনায় কটাক্ষ পড়েছে প্রায় সব বাংলা কাগজের উপর।

"সাহিত্যিক তরঙ্গ" পড়তে এখনো বেশ ভালো লাগে।

চার

প্রলাপ-সাগরের তৃতীয় উচ্ছ্বাসে "বৈয়াকরণ তরঙ্গ"।

ব্যাকরণ না হলে সাহিত্যের উন্নতি হয় না। বাংলায় ব্যাকরণের অভাব নেই বটে কিন্তু সেগুলি সহজবোধ্য নয়। কেউই নতুন দৃষ্টি নিয়ে ব্যাকরণ লেখেন না। তারা অপরের বই থেকে সংগ্রহ করে বই ছাপান পয়সার জন্য। এই দুর্গতি দূর করবার উদ্দেশ্যে লেখক নূতন ব্যাকরণ লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই প্রস্তাবে তাঁর সেই নতুন ব্যাকরণের কিছু আদর্শ পাঠক মহাশয়দের উপহার দিচ্ছেন। এই মর্মে মন্তব্য করে লেখক তাঁর আদর্শের কিছু কিছু অংশ প্রকাশ করছেন।

বঙ্গাভাষায় এই কয়টি ব্যঞ্জন বর্ণ আছে,—ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য় র ল স হ। পাঠক মহাশয় দেখুন, একেবারে কতগুলি বর্ণ কমাইয়া দিয়াছি।.........

ঙ এবং ঞ এই বর্ণদ্বয়ের ব্যবহার বঙ্গাভাষায় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং বর্ণমালা মধ্যে উহাদের স্থান হওয়া উচিত নহে। নিরর্থক বর্ণের প্রয়োজন নাই।

বঙ্গাভাষায় দুইটি নয়ের উচ্চারণগত বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না; তাহাতে আবার মুদ্রাকরের প্রেত মহাশয়ের অনুগ্রহে তাহার কিছুই ইতরবিশেষ দেখিতে পাই না। সুতরাং একটি ন থাকিলে যথেষ্ট। যদি এই ন-কার সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা সর্ববাদিসম্মত না হয়, তবে মোটামুটি এই সূত্রটী জানা থাকিলেই কাজ চলিতে পারিবে, যথা, ''রান্তে নির্মাত্রিক।'' অর্থাৎ র-কারের পর যে ন বসিবে, তাহার মাত্রা দিবে না, নেড়া করিয়া রাখিবে।

দুইটী রয়ের আকারগত ও উচ্চারণগত কিছুই বৈলক্ষণ্য নাই; সুতরাং উহাদের একটির প্রয়োজন নাই।......

জ এবং য এই বর্ণদ্বয়ের কোন বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাই না।......তবে যখন য কোন শব্দের মধ্যে বা শেষে পড়িয়া যায়, তখন তাহার নীচে একটি শূন্যের আগম হইয়া স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয়। সে জন্য য না রাখিয়া য় রাখা গেল। তিনটি সয়ের প্রয়োজনাভাব, সুতরাং বর্ণমালা হইতে (শ ষ) উঠাইয়া দিলে কোন ক্ষতি নাই।

এক্ষণে স্বর বর্ণের বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। সমুদায়ে এই কয়টী স্বরবর্ণ আছে; যথা —অ ই উ ঋ এ ঐ ও ঔ।

অ ই উ ঋ ইহাদিগকে হ্রস্ব দীর্ঘ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। 'অ'র নিকট আর একটী 'অ' আনিয়া দেও, অমনি 'আ' হইয়া যাইবে। 'ই'র নিকট আর একটী 'ই' আসিয়া বসিবামাত্র 'ঈ' হইবে। দীর্ঘ আর কিছুই নহে, ডবল মাত্র, সুতরাং পুনরুক্তি দোষ পরিহার সর্বথা শ্রেয়ঃ। বর্ণবিজ্ঞান বিষয়ে আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই।

তারপর লেখক সন্ধির আলোচনা করেছেন। স্বরসন্ধির দুই রূপ জাতীয় ও বিজাতীয়। জাতীয় সম্মেলনে ডবলীভূত হয়। ''.....বিজাতীয় সম্মিলনে দো-আঁসলা হয়।'' ''জাতীয় মিলনে দীর্ঘতাপ্রাপ্তি হয়, যথা, অ + অ = আ, ই + ই = ঈ, উ + উ = ঊ ইত্যাদি।...'' বিজাতীয় মিলনে যে অপরূপ পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা মূল জাতি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যথা; অ + ই = এ ইত্যাদি। 'ই'র সহিত অন্য স্বরবর্ণ মিলিতে আসিলে এককালে তাহার ব্যঞ্জনত্বপ্রাপ্তি হয়। 'উ'র সহিতও তদনুরূপা। 'ই'তে 'য', 'উ'তে 'ব' ইত্যাদি। স্বর সন্ধির মোটামোটী নিয়ম এই পর্য্যন্ত।

ব্যঞ্জন সন্ধি সম্বন্ধে লিখিবার পূর্বে শিক্ষার্থীদিগকে একটী বিষয় বলিয়া দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। ব্যঞ্জন সন্ধিতে অনুস্বার ও বিসর্গের প্রকৃতি অগ্রে জ্ঞাত না হইলে কোন কার্যই হইবে না। অনেকে অনুস্বার ও বিসর্গকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলেন, কিন্তু আমরা এত মূর্খ নই যে, বৃথা গন্ডগোল বাড়াইব। ম'য়ের হাপ অনুস্বার এবং স'য়ের হাপ বিসর্গ। মকারকে সন্ধি দ্বারা যত বাদ দিবার চেষ্টা কর না কেন, কখনই অনুস্বার অপেক্ষা ন্যূন করিতে পারিবে না; সকেও বিসর্গ অপেক্ষা কমাইতে পারিবে না। ইহা ব্যঞ্জন সন্ধির মূল নিয়ম জানিবে। সন্ধির সহিত শ্রবণ সুখকারিতার অনেক সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ সন্ধি করিলে যদি শ্রুতিকটু হয় বিচেনা কর, তবে তাহাতে হাত দিয়া অযশভাগী হইবার কোন আবশ্যক নাই। ব্যঞ্জন সন্ধিতে অনেক সময় এই দোষ ঘটে, এই জন্য সকল সময়ে সন্ধি না করিলেই ভাল হয়। অতএব ব্যঞ্জন সন্ধির উৎকট নিয়ম সকল এ স্থানে প্রকাশ করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলাম না। বর্ণমালায় যে কারীগরী করা হইয়াছে, তাহাতে আর ণত্ব ও ষত্ব বিধির কোনই প্রয়োজন নাই।

দ্রব্য মাত্র বিশেষ্য, আবার যদ্দ্বারা তাহাকে বিশেষ করা যায় তাহার নাম বিশেষণ। পাঠকবর্গ যেখানে কোন নিয়ম না পাইবেন, সেখানে সকলই নিপাতনে সিদ্ধ করিতে পারিবেন। নিপাতনটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সময়ে সময়ে ইহার দ্বারা অনেক মান বাঁচিয়া থাকে।

সমাস সন্ধির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তাহারা দুয়ে ভাই।

লিঙ্গ বিষয়ে বঙ্গভাষায় অত্যন্ত গোলযোগ আছে, সে জন্য তৎসম্বন্ধীয় দুই একটী কথা এই আদর্শ মধ্যে প্রকাশ করা উচিত। জীব সমষ্টি মধ্যে পুং জাতি মাত্রই পুং লিঙ্গ, স্ত্রী জাতি মাত্রই স্ত্রী লিঙ্গ। যাহাদিগের জীবন নাই, তাহারা ক্লীব লিঙ্গ। লিঙ্গ বিষয়ক এই নিয়মটী মূল নিয়ম মাত্র, কিন্তু নির্জীব জড় পদার্থ মধ্যেও শাস্ত্রকারেরা লিঙ্গ ভেদ করিয়াছেন। তাহা এতদূর কঠিন যে, পণ্ডিতেরাও সময়ে সময়ে আয়ত্ত করিতে পারেন না। সেই অনুসারে বঙ্গীয় বৈয়াকরণেরা পদার্থ মাত্রের লিঙ্গত্ব বিষয়ে ভারি গোলযোগ করিয়াছেন। লিঙ্গ ভেদ বিষয়ে গুটীকতক মোটা কথা জানিয়া রাখিলেই কার্য চলিতে পারে। সেকথাগুলি এই—

আকারান্ত হইলেই স্ত্রী লিঙ্গ হইবে, তন্মধ্যে বাবা, দাদা খুড়া, জ্যাঠা, মামা, কাকা প্রভৃতি কতকগুলি বর্জিত বিধির মধ্যে জানিবে। ঈকারান্ত শব্দ স্ত্রী লিঙ্গ, কিন্তু বটীকে স্ত্রী লিঙ্গ বলিতে পারি না। কারণ বটীতে দ্রব্যাদি কাটিয়া থাকে; কাটা মারা প্রভৃতি গোয়ারতুমির কাজ স্ত্রীলোকে সম্ভবে না। এই জন্য উহাকে পুং লিঙ্গ বলিতে হইবে। কোন শব্দ বাস্তবিক পুং লিঙ্গ কিন্তু তাহার

অর্থ লইয়া বিচার করিলে তাহা স্ত্রী লিঙ্গ হইয়া যায়। বৃক্ষ শব্দ পুং লিঙ্গ কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মায় যে উহা স্ত্রী লিঙ্গ। কারণ বৃক্ষে ফল পুষ্প প্রসব করে; প্রসব শক্তি স্ত্রী লোক ভিন্ন পুরুষের নাই, এই জন্যই উহাকে স্ত্রী লিঙ্গ বলিতে হইবে। ইহার মধ্যেও বর্জিত আছে— যথা ঃ মান্ধাতা।......

লেখক "বর্জিত" শব্দটি ব্যাতিক্রম ("exception") অর্থে ব্যবহার করেছেন। তারপর কিছু সার কথা বলে ও কৌতুক করে লেখক প্রস্তাবটি শেষ করেছেন।

ব্যাকরণের যাবতীয় নিয়ম বিবেচনা সাপেক্ষ, শাস্ত্রসাপেক্ষ নহে। এরূপ সৎযুক্তি অনুসরণ করিয়া যিনি ব্যাকরণ লিখিবেন, তিনিই কৃতকার্য হইতে পারিবেন। যুক্তি হইতেই শাস্ত্রের উৎপত্তি, কিন্তু ক্রমে ক্রমে যুক্তি ও শাস্ত্র উভয়ে এত স্বতন্ত্র হইয়াছে যে, প্রথম হইতে দ্বিতীয়ের উৎপত্তি ইহা আদৌ বুঝিতে পারা সুকঠিন।.....সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি ভিন্ন বঙ্গাভাষায় অপর কেহ ব্যাকরণ লিখিতে সমর্থ হইবে না, ইহা যেন কাহারও মনে উদয় না হয়। ব্যাকরণ লেখা নিতান্ত সহজ, তাহা না হইলে আমি কখনই ব্যাকরণঘটিত এ সকল কথা বলিয়া দিতে পারিতাম না। অদ্য এই স্থানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম।

পাঁচ

প্রলাপ-সাগরের চতুর্থ উচ্ছ্বাসে "ঐতিহাসিক তরঙ্গ"

সভ্য দেশে ইতিহাস রচনায় উৎসাহ ও ইতিহাস পাঠে আগ্রহ লক্ষ্য করে লেখক ইতিহাসের স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

ইতিহাস দুই ভাগে বিভক্ত; পুরাবৃত্ত ও ইতিবৃত্ত। যাহাতে প্রাচীন কালের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম পুরাবৃত্ত এবং যাহাতে ইতি অর্থাৎ শেষ কালের বিবরণসমূহের জ্ঞান জন্মে তাহার নাম ইতিবৃত্ত। কিন্তু ইতিহাস শব্দটী এরূপ ওতপ্রোতভাবে পুরাবৃত্ত ও ইতিবৃত্ত শব্দদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে যে, এক হইতে অন্যের উদ্ধার সহজ ব্যাপার নহে। এরূপ হইবার কারণ কি?

লেখকের মতে এ প্রশ্নের উত্তর তিনি ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারবেন না। লেখক বলেছেন, "আমি অনেক অনুসন্ধান চিন্তা শক্তির পরিচালনার দ্বারা ইতিহাস শব্দের ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছি এবং আমার সেই জ্ঞান সাধারণকে উপহার প্রদান করিতেছি। তাহা পাঠ করিলে আমার চিন্তাশীলতার সবিশেষ পরিচয় পাইবেন।'

ইতিহাস কাহাকে বলে?—যাহার ইতি অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত পাঠ করিলে হাস্য করিতে হয়, তাহারই নাম ইতিহাস। সুতরাং পুরাবৃত্ত এবং ইতিবৃত্ত এই উভয় শ্রেণীর মধ্যেই ইতিহাস থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কোন ইউরোপীয়

নরপতি একজনকে অকারণ অনবরত হাস্য করিতে দেখিয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ ব্যক্তি এত হাস্য করিতেছে কেন?" তাহাতে মন্ত্রী মহাশয় উত্তর করিলেন, "এ ব্যক্তি হয় পাগল, না হয় তো ডনকুইকসট্ পাঠ করিয়াছে।" ডনকুইকসট্ একখানি অতি উৎকৃষ্ট হাস্যরস প্রধান গ্রন্থ; উহার ঘটনাগুলিকে গ্রন্থকার এরূপ হাস্যরসোদ্দীপক করিয়াছেন, যে তাহারা যখন স্মরণপথে আসিবে, তখনই হাস্য সম্বরণ করিতে পারা যাইবে না। আমিও ইতিহাস সম্বন্ধে সেই কথা বলিতে পারি।......

তারপর লেখক প্রশ্ন তুলেছেন ইতিহাস সম্বন্ধে এসব কথা বলবার তার কিসের অধিকার। উত্তরে বলেছেন,

আমাদের দেশের লোকের কিছুতেই চৈতন্য হইবে না। তাহারা কিছুরই মূল অন্বেষণ করিবে না, অনুবাদেই সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের সার সংগ্রহ করিবে। আমাদের দেশের ইতিবৃত্ত—তাহাও ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিতে হইবে। আমাদের দেশের ভূগোল, —তাহাও ইংরাজী হইতে অনুবাদ না করিলে চলিবে না। বিষ্ণুপুরাণের সার মর্ম কি?—উইলসন পাঠ কর, জানিতে পারিবে। এতক্ষণে বোধহয় অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন, ইতিহাস পাঠ করিলে কেন হাস্য করিতে হয়?.....

দুঃখের কথা কি বলিব, আর্য্যধর্ম শাস্ত্রের কোন বিশেষ প্রসঙ্গ জানিতে হইলে উইলসন, জোন্স, গোলডস্টুকার, মোক্ষমূলর, মুয়ার, ওয়েবর, কোলব্রুক্ প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিতগণের পদলেহন করিতে হয়। ভারত ইতিহাস সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। যদি কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষের ইতিহাস সংগ্রহে যত্নবান হয়েন, তবে তাহার উপকরণ সকল সাগরপার হইতে আহরণ করিতে হইবে, নতুবা গ্রন্থ সর্বাঙ্গ সুন্দর হইবে না।....

এক দেশের লোকের দ্বারা সংগৃহীত দেশান্তরের ইতিবৃত্তে সর্বাঙ্গ সুন্দর হওয়া সুকঠিন। এককালে হইতে পারে না, এমন কথা বলিতে পারা যায় না। লিখিতব্য বিবরণের বিশেষজ্ঞ নিরপেক্ষ লেখক হইলে অবশ্যই ঈপসিত ফল লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহা সচরাচর সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? ইতিহাস সম্বন্ধে আরও একটি দোষ ঘটিয়াছে, যাহার যাহা মনে আইসে, তিনি তাহাই লেখেন। সুতরাং সময়ে সময়ে ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ....বোধহয়, লেখক মহাশয়েরা কেবল বাহাদুরী লইবার জন্যই এরূপ করিয়া থাকেন।.....

তারপর লেখক নূতন কথার কিছু নিদর্শন দিয়েছেন। যেমন, "মহাভারত যুদ্ধের অনেক পরে রামচন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।" অথবা "জানকী রামের ভগিনী।" কিংবা "রাধা নন্দ ঘোষের কন্যা।" অথবা "লবণাসুর তীব্র শক্তির প্রভাবে কেহ ভাবিয়া

চিন্তিয়া স্থির করিলেন,'' ''যেন রাজারা বৈদ্য নহেন, কায়স্থ।'' পুরাতত্ত্বজ্ঞের অনুসন্ধান, কিছু বলিবার যো নাই। দেশীয় চর্ম্মবরণে বিলাতি অস্থিমাংশ (sic) আবরিত, সুতরাং একপ্রকার না হইবার বিষয় কি?

> কোন মহাত্মা এদেশীয়দিগের চরিত্র চিত্র করিতে বসিয়া লিখিলেন ''মহিষের যেমন শৃঙ্গ থাকিবেই, ব্যাঘ্রের যেমন থাবা থাকিবেই, বাঙ্গালী তেমনি চাতুরী সম্পন্ন হইবে।'' তিনি যে সকল উপমা ব্যবহার করিয়াছেন তন্মধ্যে একটি ভ্রম দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। ''তাঁহার নিজের যেমন লাঙ্গুল থাকিবেই।'' এ বাক্যটি কেন তিনি আমাদের মাথা খাইতে ভুলিয়া গেলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আমাদেরা দেশের ইতিহাস নিয়ে ''এই প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে'', ভবিষ্যতে আরও অনেক হবে। ভবিষ্যতে ভারত-ইতিহাস কী রকম দাঁড়াবে তার নমুনা এই চারছত্র পয়ারে দিয়ে প্রস্তাব শেষ হয়েছে,

নর বানরের হাতে মরে চতুর্ম্মুখ।
হনুমান কেড়ে লয় ইন্দ্রের ধনুক।।
কঙ্কে ফেটে রক্ত পড়ে কাঁদে কালকেতু।
নলে নীলে বেঁধে গেল কলিকাতার সেতু।।

চমৎকার।

ছয়

প্রলাপ-সাগরের পঞ্চম উচ্ছ্বাস ''ভৌগোলিক তরঙ্গ।'' তরঙ্গটি তুলনায় নিস্তেজ এবং ছোট। কতকটা যেন প্রথম ও চতুর্থ উচ্ছ্বাসেরই ঢেউয়ের জের। লেখক ভূগোলকে বলেছেন ভূয়োগোল।

পাঠ্য ভূগোল শিক্ষার লেখক একটি প্রধান ত্রুটি ধরেছেন এটলাসের অভাব। ''ভূগোলশাস্ত্র পাঠ সহজ সাধ ও নহে। চিত্র ভিন্ন তাহার পাঠ হইতে পারে না।'' এখানে চিত্র মানে atlas (এবং globe?) তারপর লেখক ''এটলাস'' শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরেছেন।

ইংরাজী ভাষায় 'লস্' শব্দের অর্থ লোকসান।

''এটলস'' শব্দের অপভ্রংশে এটলাস হইয়াছে।

> তাহার অর্থ এই যে ইহা এককালে লোকসান মাত্র। যাহার গোড়ায় সম্পূর্ণ গোল, তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইলে অদৃষ্টে অনেক লোকসান হইবার সম্ভাবনা।

ঐতিহাসক তরঙ্গের অনুযোগ লেখক এখানে টেনে এনেছেন,—''আমাদের সমুদায়ই অনুবাদ।''

> ...আমরা অনুবাদ এবং অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করিয়া আমাদের প্রকৃত উচ্চারণগুলি ভুলিয়া যাইলাম। আর আমরা পেড়ো বলি না, টিকিট লইবার

সময় 'পাওয়া' বলিয়া থাকি। কৃষ্ণগঞ্জ না বলিয়া 'কিশেন্ গন্জ' বলি। কলিকাতা নাম আর মনে আইসে না, 'ক্যালকাটা' বলা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। হাবড়া চুলোয় গিয়াছে, এখন তাহার পরিবর্তে হাওড়া না বলিলেন অনেকে বিরক্ত হয়েন।

তারপর লেখক হাবড়া নামের ব্যুৎপত্তির প্রসঙ্গে বড়া হারানোর গল্পটি বলেছেন। তারপর,

ভূগোলকে সাধে ভূয়োগোল বলিয়া উপেক্ষা করিতেছি না। পবিত্র সলিলা গঙ্গা দেবী ছাপ ঘটীর মোহানায় আসিয়া নাম হারাইলেন; তথা হইতে নবদ্বীপ পর্য্যন্ত তাঁহার নাম হইল ভাগীরথী, আবার তথা হইতে বঙ্গোপসার পর্যন্ত হুগলী নামে জাহির হইলেন। পদ্মার নামোল্লেখও অনেক ভূগোল গ্রন্থে দেখিতে পাই না।...এমন দৃষ্টান্ত দিয়া প্রস্তাব পূর্ণ করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। পাঠক মহাশয়রা একটু বিবেচনা করিলেই জানিতে পারিবেন। এই জন্যই বলি ভূয়োগোলে সময় নষ্ট করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন।

লেখা বেশ কাঁচা হাতের তাতে সন্দেহ নেই, তবে তার মধ্যে যে পাকা চিন্তা ছড়িয়ে আছে তার মূল্য সম্বন্ধেও সংশয় নেই। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী রচনায় এইসব ভাবনার কোনো কোনোটির দেখা মিলছে পাকা রঙে। লেখার ছাঁদে রবীন্দ্রনাথকে ধরা দুরূহ নয়। অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথের মুখের এবং তদাশ্রিত লেখার ভাষায় মেয়েলি ইডিয়মের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। য়ুরোপপ্রবাসী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র পড়লেই তার প্রমাণ মিলবে। প্রলাপ-সাগরেও মাঝে মাঝে বেশ মেয়েলি ঢং আছে।

নিতান্ত অল্প বয়সের রচনা—(দু একটি ভুল বানানও আছে) হলেও প্রলাপ-সাগরের জন্যে লেখকের লজ্জা পাবার কোনো কারণ ছিল না।

রচনাটি এখনো মূল্যহীন নয়।

পণ্ডিতিয়া

নাটশালা : সত্যবীজের ঝাড় থেকে

এক

[চাটপেড়ে গ্রামে মাধবমুদির পাঠশালা বসেছে সকালবেলায়। গুরুমশাই চৌকিতে বসে, ছেলেরা দু-সারি সঙ্গো বই খাতা পেনসিল নিয়ে। হাজিরা নেওয়া হল।]

গুরুমশাই : হ্যাঁরে ঘনা, দুদিন তুই পড়তে আসিসনি কেন? হয়েছিল কী? চুপ্ করে রয়েছিস কেন। বল্।

ঘনশ্যাম : (কাঁচুমাচু মুখ করে) আজ্ঞে, আজ্ঞে, আমার বাবার শরীর ভালো ছিল না।

গুরুমশাই : তোর বাবার অসুখ করেছিল তাতে তোর কী? তুই কি বাবার মাথা টিপে দিচ্ছিলি?

ঘনশ্যাম : আজ্ঞে না, কিছু করিনি।

গুরুমশাই : তবে?

ঘনশ্যাম : আজ্ঞে, ডাক্তারখানায় যেতে হয়েছিল। বাড়িতে আর কোনো বেটাছেলে নেই।

গুরুমশাই : আচ্ছা। ওদের কাছে দেখে নে, কাল ও পরশু কী পড়া ছিল। তা করে নিবি। কাল ধরব। [ছেলেদের দিকে চোখ বুলিয়ে—তোরা সব চেঁচিয়ে পড়া কর। আমি এখনি আসছি।]

[গুরুমশায়ের প্রস্থান।]

[পড়ুয়া দুর্গাদাস অধিকারী ঘনশ্যামের চেয়ে বছর চারেকের ছোট, বুদ্ধিতে কিছু নিরেস। তবে বেশ চালাক, স্বভাবে খল। দুর্গাদাসের কাছ থেকে ঘনশ্যাম পুরোনো পড়া জেনে নিয়ে চেঁচিয়ে মুখস্থ করতে লাগল। অপর ছেলেরা তাদের আজকের পড়া করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে গুরুমশাই ফিরে এলেন, পাঠশালা চলতে লাগল।]

দুই

[মাস কতক পরের কথা। ঘনশ্যামের পিতৃবিয়োগ হয়েছে। পিতা জাতিবৃত্তি করতেন। তাতেই সংসার চলত। ঘনশ্যাম সে বৃত্তির ধার ধারে না। সংসারে তার মা ছাড়া আর কেউ নেই। জমিজমা কিছু আছে। তাতে ভাত কাপড় কায়ক্লেশে চলে যেতে পারে, ভদ্রভাবে সংসার চালানো যায় না। পাঠশালায় সে মুরুব্বি ছেলের মতো ছিল। গুরুমশাইকে তার অবস্থার কথা জানালে তিনি বললেন, যে ক্রোশ তিন-চার দূরে তালডোবা গাঁয়ে নাকি পাঠশালা করবে। তাঁর কাছে ওরা যদি আসে তবে তার কথায় ঘনশ্যামকে নিতে পারে। ঘনশ্যাম খুসি হয়ে বাড়ি গেল।

গুরুমশায়ের কথা ফলল। তালডোবা গাঁয়ের নতুন স্থাপিত পাঠশালায় ঘনশ্যাম চাকরি পেলে। ঘনশ্যামের গুরুমশাই ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঘনশ্যাম ব্রাহ্মণ ছিল না। কিন্তু চাকরি দেওয়ার সময় সে বুঝতে পেরেছিল যে তালডোবার লোকেরা তাকে ব্রাহ্মণ বলে মনে করেছে তখন ঘনশ্যাম আত্মরক্ষার জন্যে পৈতৃক পদবি ঘোষের স্থানে বাঁড়ুরী পদবি নিলে। এতে দুদিক বজায় রইল। এ পদবি ব্রাহ্মণের হতে পারে নাও হতে পারে। ঘনশ্যাম নির্বোধ নয়। তালডোবায় চাকরি পেয়ে সে গ্রামে যেত মাকে দেখতে তবে গুরুমশাই আর দুর্গাদাসের কাছে যেত না। তবে গুরুভক্তি ও বন্ধু প্রীতি তার একটুও কমেনি। কিছুকাল পরে দুর্গাদাসও পাঠশালে পড়া ছেড়ে দিয়ে এক গাঁয়ে—নাম জেলেগড়ে— পাঠশালা খুললে।

মাধব দত্ত প্রথমে মুদির দোকান খুলেছিল। সে দোকান ভালো না চলায় তা উঠিয়ে দিয়ে সে পাঠশালা খুলেছিল। লোকে বলত মাধব মুদির পাঠশালা।

ছেলেবেলা থেকে মাধব লুকিয়ে চুরিয়ে নেটো শুনতে যেত, তার বাবা পছন্দ করত না বলে। বড় হয়ে সে ভিন গাঁয়ে নেটো হলে শুনতে যেত। এই সময়ে সে একটি বন্ধু লাভ করেছিল। সে পাশের আলমডাঙা গ্রামের অধিবাসী সলিমুল্লা। সলিমুল্লার নেটোর শখ আছে। বলতে কইতে পারে। গান গাইবার গলা আছে। মাধব তাকে বার বার বলেছিল নেটোর দল খুলতে। সে রাজি হয়নি। বলেছিল, বাঁধনদার কোথায় পাব। মাধব তাকে পালা লিখে দিয়ে নেটোয় নামিয়েছিল। বাঁধনদার হিসেবে মাধবের কিছু আয়ও হতে লাগল।

নেটোর গান, পালা লেখায় মন বসে যাওয়ায় মাধব পাঠশালা উঠিয়ে দিলে। তখন সলিমুল্লার নেটোর দলের খুব নামডাক হয়েছে।]

তিন

[তালডোবা আর জেলেগড়ে গ্রাম দুটি খুব দূরে নয়। তা ছাড়া গ্রাম দুটির মধ্যে নিবিড় সম্পর্কও ছিল। স্থানীয় কোটাল জমিদার লালমোহনের বাস তালডোবায় আর তাঁর শ্বশুরবাড়ি জেলেগড়ে। ঘনশ্যাম ও দুর্গাদাস দুজনে দুদিক থেকে লালমোহনের প্রিয় হয়েছিল। দুজনে আবার এক হল। নানারকম চেষ্টা চালিয়ে ঘনশ্যাম হল লালমোহনের সভাপণ্ডিত আর দুর্গাদাস হল তাঁর প্রধান পুরোহিত।

কোন্ এক গাঁয়ে গিয়ে লালমোহন সলিমুল্লার নেটো শুনে মুগ্ধ হয়। সে সংদার সলিমুল্লা আর বাঁধনদার মাধব দত্তকে তার গাঁয়ে গাইতে আসার নিমন্ত্রণ করে এবং বলে যে দুজনকে পুরস্কৃত করা হবে। বাড়ি ফিরে এসে লালমোহন ঘনশ্যাম ও দুর্গাদাসকে পরামর্শের জন্যে ডাকলে। দুজনে এল।]

লালমোহন : তোমরা সলিমুল্লার নেটো শুনেছ?

[ঘনশ্যাম ও দুর্গাদাস ইতস্তত করতে লাগল।]

লালমোহন : আমার কাছে বলতে সংকোচ কী?

দুজনে : আজ্ঞে হ্যাঁ শুনেছি।

লালমোহন : কেমন লেগেছিল?

দুজনে : আজ্ঞে, মন্দ নয়।

লালমোহন : মন্দ নয় কী হে! খুব ভাল। — সে যাই হোক। সলিমুল্লার দলকে বায়না দিয়েছি। গাওয়া হলে পর ওদের পুরস্কার দোব। কীভাবে পুরস্কার দেওয়া হয় তার পরামর্শের জন্যে তোমাদের ডেকেছি। বল কী করব।

ঘনশ্যাম : আজ্ঞে, শুধু সলিমুল্লাকে তো? তাহালে গায়ে আতর ছিটিয়ে থালা করে কিছু রূপোর টাকা দিলেই হবে।

লালমোহন : শুধু সংদার সলিমুল্লা নয়, তার সঙ্গো বাঁধনদার মাধবদত্তও থাকবে।

[মাধব দত্ত আসবে শুনে দুজনের মাথায় যেন বাজ পড়ল। তাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখলে সব কথা মাধব দত্তর মনে পড়বে। তা হলে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গো যাবে। মহা মুশকিলে পড়া গেল।]

লালমোহন : কী হে, দুজন গুম্ মেরে গেলে যে।

দুর্গাদাস : আজ্ঞে, আজ্ঞে .....

লালমোহন : (ধমক দিয়ে বলে উঠলেন) যা বলবে স্পষ্ট করে বল।

দুর্গাদাস : আজ্ঞে, মাধব দত্তকে লোকে মানে সলিমুল্লার নেটোর দলের বাঁধনদার বলে কিন্তু তা নয়। নেটোব পালা ও গান অন্য লোকে লিখে দেয়। ও তা নিজের বলে চালায়।

লালমোহন : (বিস্ময়ের সুরে) তাই নাকি? কে সে লোক?

[দুর্গাদাস ঘনশ্যামের দিকে চাইলে। ভাবখানা দাদা এবার তোমার পালা।]

ঘনশ্যাম : আজ্ঞে মাধব দত্তের সম্বন্ধী ওই সব পালা ও গান লেখে।

লালমোহন : কই তার তো নাম শুনিনি কখনো!

ঘনশ্যাম : শুনবেন কী করে? সে কলকাতায় থাকে। এক খবরের কাগজের ছাপাখানায় কাজ করে। সেখান থেকে ভগিনীপতিকে লিখে-টিকে পাঠায়। সে তো বেশি লেখা পড়া জানে না। লিখতে গেলে ভুল-টুল হয়। মাধব দত্ত সে সব ভুল শুধরে নিজের নামে চালিয়ে দেয়।

লালমোহন : এত কথা জানলে কী করে?

দুর্গাদাস : হুজুর আমাদের দুজনের বাড়ি যে ওই মাধব দত্তেরই গাঁয়ে।

লালমোহন : বটে! বটে !

[ছাড়লেন এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস। পুরস্কার দানের প্রস্তাব করার পর থেকে তাঁর মনে স্বস্তি ছিল না। খেয়ালের মাথায় বলে ফেলা উচিত হয়নি। এখন মন জুড়িয়ে গেল।]

সমস্যাপূরণ

গল্পটি অনেকের একটুখানি জানা আছে, সবখানি কারো জানা নেই তাই বলছি।

সেকালে যাঁরা লেখাপড়া করতেন, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধির একরকম খেলা চলিত ছিল যাকে বলত সমস্যাপূরণ। একজন এক আধ ছত্র কবিতা দিয়ে অপরকে বলত সেটি পূর্ণ করতে। ঠিকমতো কবিতা পূরণ করতে পারলে খুব প্রশংসা হত। এ রকম খেলা টোলে বিদ্যালয়ে যেমন পণ্ডিতসভায় ও রাজসভায়ও তেমনি সমাদৃত ছিল।

একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁর সভায় অন্য কাজকর্ম না থাকায় বললেন, 'অনেকদিন সভায় সমস্যাপূরণ-টূরণ হয়নি। আপনারা সব মিইয়ে গেলেন কেন?'

রাজার ইচ্ছা হয়েছে। না বলবার পথ নেই। মন্ত্রী শারদানন্দ বললেন, 'মহারাজ উত্তম প্রস্তাব করেছেন। কালিদাস না হয় এখন একটা সমস্যা দিন।'

মন্ত্রী কালিদাসের নাম করলেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। যিনি সমস্যাপূরণের প্রশ্ন দেবেন তিনি উত্তর দিতে পারবেন না। খেলায় তিনি মধ্যস্থ অর্থাৎ রেফারি হয়ে থাকবেন। কালিদাস খেলায় যোগ দিলে অন্য সভ্যরা থই পাবে না। তাহলে মজা তেমন জমবে না।

মন্ত্রীর কথা শুনে রাজা কালিদাসের মুখের দিকে চাইলেন। অমনি কালিদাস দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'মন্ত্রী মহাশয়ের আদেশ অনুসারে আমি এই কবিতা ছত্রটি সমস্যা পূরণের প্রশ্নরূপে উপস্থাপন করছি,

"নাস্তীতি খাদ্যতে স্বাদু বর্ততে চেন্ ন লভ্যতে।"

(অর্থাৎ— " নেই তাই খাচ্ছ থাকলে কোথা পেতে?")

কবিতা- ছত্রটি কালিদাস ধীরে ধীরে তিনবার আওড়ালেন। কেউ বা লিখে নিলে, কেউ বা মনে ধরে নিলে। তারপর সবাই সমাধান ভাবতে লাগল। সভা একদম নীরব।

সভা চুপচাপ মেরে যাওয়াতে রাজার ভাল লাগল না। তিনি বললেন, 'সমস্যাটি যদি কঠিন মনে হয় তবে আপনারা ভাববার জন্যে এক আধদিন সময় নিতে পারেন। সমস্যাটি চমৎকার হয়েছে। আমি বলি কী, আজ সভা এইখানে মুলতুবি থাক। পরশু আবার সভায় মিলব। তখন সমাধান শুনব।'

রাজায় কথায় সমস্যাপূরণকারীরা খুসি হল। শ্রোতারা দমে গেল। উপায় কী। রাজার হুকুম।

সভা ভঙ্গ হবার আগে মন্ত্রী বললেন, 'তাহলে আমি প্রস্তাব করছি যে পরশু যাঁরা সমাধান করতে চান তাঁরা আজ আমাকে তাঁদের নাম দিয়ে রাখুন। তাহলে সভার কাজ সুশৃঙ্খলায় হবে। সভার অধিবেশনও দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর হবে না।'

রাজা-প্রজা সকলেই মন্ত্রীর প্রস্তাবে সাধুবাদ করলেন। নাম দিলেন তিন জন মাত্র। প্রবীণ কবি বররুচি, গণিতজ্ঞ জ্যোতির্বিদ্যাবিদ্ বরাহমিহির, ও নবীন কবিযশঃ-প্রার্থী ঘটকর্পর।

তিন দিনের দিন রাজসভা বসেছে। সভারম্ভের মামুলি অনুষ্ঠানের পর মন্ত্রী রাজার অনুমতি নিয়ে প্রথমে আহ্বান করলেন বররুচিকে।

বররুচি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর রাজাকে ও সভার লোকদের নমস্কার জানিয়ে তাঁর সমাধান শ্লোক পড়লেন।

"নাস্তীতি খাদ্যতে স্বাদু বর্ততে চেন্ ন লভ্যতে।
মধুপৈস্ ত্যক্তচক্রে তু সমস্যা পূর্যতে শুভা।।"
(অর্থাৎ— নেই তাই খাচ্ছ থাকলে কোথা পেতে।
মাছি ছাড়া চাক দেখ মেলে সমস্যাতে।।)

শুনে সভায় সাধুবাদ উঠল। একাংশ থেকে শোনা গেল, 'বুঝিয়ে দিন, বুঝিয়ে দিন।' তখন কালিদাস উঠে বুঝিয়ে দিলেন শ্লোক করে। এখানে বাংলা অনুবাদ দিই।

"অগাধ বনেতে এক যুবা দিশেহারা,
ক্ষুধার জ্বালায় বুঝি এই পড়ে মারা।
দেখে এক মৌচাক। মাছি নেই তাতে।
মধু আছে। খেয়ে তাই ফিরে এল ধাতে।।"

শুনে সকলে সাধুবাদ দিলে। তারপর মন্ত্রীর আহ্বানে বরাহমিহির উঠে তাঁর সমাধান শ্লোক পড়লেন।

"নাস্তীতি খাদ্যতে স্বাদু বর্ততে চেন্ ন লভ্যতে।
ছায়াত্মাপি যথা রাহুর্ গ্রসতে রবিচন্দ্রকৌ।।"
(অর্থাৎ— নেই তাই খাচ্ছ থাকলে কোথা পেতে।
ছায়াময় রাহু যেত কি চাঁদ সূর্য খেতে।।)

শুনে সভায় সাধুবাদ উঠল, তবে আগেকার মতো প্রবলভাবে নয়। কালিদাস বুঝলেন বরাহমিহিরের সমাধান অনেকে ধরতে পারেনি। তিনি দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'শুনুন বরাহমিহিরের সমাধানের তাৎপর্য।' বাংলা অনুবাদ দিই—

"কায়া নেই ছায়া আছে, রাহু-ও-কেতুর,
তাই রাহু গ্রাস করে চন্দ্রমা ও সুর।
থাকিলে তাহার দেহ খেতে নাহি যেত,
পেট ফেটে গিয়ে সে যে কবে অক্কা পেত।
দাঁত নেই পেট নেই তাই খেতে চায়।
দাঁত পেট থাকিলে কি কভু খেতে যায়।।"

কালিদাসের ব্যাখ্যা শুনে সভায় সকলে সাধু সাধু বলে উঠল। তারপর মন্ত্রী ঘটকর্পরকে তাঁর সমাধান-শ্লোক পড়তে বললেন।

ঘটকর্পর উঠে নম্র হয়ে নমস্কার করে পড়লেন তাঁর শ্লোক।

"নাস্তীতি খাদ্যতে স্বাদু বর্ততে চেন্ ন লভ্যতে।
হীনপুচ্ছা ক্ষতক্লিষ্টা গৌর্ দষ্টা কাকচঞ্চুনা।।"
(অর্থাৎ— নেই তাই খাচ্ছ থাকলে কোথায় পেতে।
লেজখসা ঘেয়ো গোরু কাকের কামড়েতে।।)

সাধুবাদ উঠল, তবে জোরে নয়। কালিদাস উঠলেন বুঝিয়ে দিতে। বাংলা অনুবাদ দিই।

"লেজখসা ঘায়ে ভরা গোরু দেখে মাঠে,
কাক এক পিঠে তার ঠোকরায় ঠোঁটে।
তাই দেখে কবি বলে পথে যেতে যেতে,
নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথা পেতে।
থাকলে গোরুর লেজ ঘা নাহিক হত,
পিঠেতে বসিলে কাক লেজে তাড়াইত।।"

শুনে উচ্চকণ্ঠে সাধুবাদ উঠল।

রাজা মন্ত্রীকে বিচারের ভার দিলেন। মন্ত্রী উঠে বললেন, কবিবর বররুচি ও পণ্ডিতপ্রবর বরাহমিহির উত্তম সমাধান করেছেন। আমি কিন্তু পুরস্কার তাঁদের না দিয়ে নবীন কবি ঘটকর্পর যিনি এখনকার দিনের বাস্তব ভাবনার উপযোগী সমাধান দিয়েছেন তাতে পাণ্ডিত্যের কমতি থাকলেও তাঁকেই দিচ্ছি। আশা করি লব্ধপ্রতিষ্ঠ বররুচি ও বরাহমিহির এতে ক্ষুণ্ণ হবেন না।"

মন্ত্রীর কথায় প্রচুর সাধুবাদ উঠল। বররুচি ও বরাহমিহিরও অখুসি হলেন না।

সভাভঙ্গ হয়ে গেলে পর ঘটকর্পর কালিদাসের পেছু পেছু বাইরে এসে একান্তে পেয়ে বললেন, 'দাদা আমাকে ক্ষমা করুন। আমি বড়ো অপরাধ করেছি আজ আপনাকে ভাঙিয়ে।'

কালিদাস বললেন, 'সে কী কথা! খুলে বল।'

ঘটকর্পর কিন্তু কিন্তু হয়ে বললেন, 'অনেক দিনের কথা। তখন আমি নিতান্ত ছেলেমানুষ। একদিন বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে পথে আপনার সঙ্গে দেখা হলে পর আমরা তিনজনেই বেড়াচ্ছিলুম। যেতে যেতে আপনি একটা গোরুর পিঠে কাককে ঠোকরাতে দেখে তা আমাকে দেখিয়ে একছত্র ছড়া বলেছিলেন যার ভাবার্থ,

"ওহে কাক!
নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথা পেতে।"
বাবা সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ছত্র রচনা করলেন, যা ভাবার্থ—
"কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে।।"

সংস্কৃত মূল শ্লোকটি এই,—

"নাস্তীতি খাদ্যতে স্বাদু বর্ততে চেন্ না লভ্যতে।
কথিতং কালিদাসেন কবিনা পথি গচ্ছতা।।"

কালিদাস হেসে উঠলেন। বললেন, 'খুব তো মনে রেখেছ। তবে তোমার লাভের অর্ধেক যদি আমার পাওনা হয় তবে বাকি অর্ধেক তোমার বাবার পাওনা। বাবার পাওনা তুমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে গেছ। আমার পাওনাও তোমাকে দিলুম। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘর যাও।'
